Vol. 54 | No. 2 | 2017

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

নোয়াখালীর লোকজ ছড়ার ভাষা-বৈশিষ্ট্য

Volume	54
Issue	2
Year	2017
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	মোহাম্মদ মোজাম্মেল হোসেন
Published online	February 1, 2017
DOI	10.62328/sp.v54i2.7
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v54i2.7
Pages	১২৭-১৫৮
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

নোয়াখালীর লোকজ ছড়ার ভাষা-বৈশিষ্ট্য

মোহাম্মদ মোজাম্মেল হোসেন*

সারসংক্ষেপ : ভাষা নদীর মতো বহমান। নদী যেমন বিভিন্ন শাখা-নদীতে ছড়িয়ে পড়ে তেমনি মূলভাষা থেকে বিভিন্ন শাখা-ভাষার সৃষ্টি হয়। মূল নদীর স্রোতধারা শাখা-নদীতে প্রবেশ করার পর তার আকৃতি-প্রকৃতিগত পরিবর্তন ঘটে। তেমনি মূলভাষার শব্দ অনেক ক্ষেত্রে তার ধ্বনিগত পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে শাখাভাষায় এবং শাখাভাষা থেকে উপভাষা বা আঞ্চলিক ভাষায় পরিবর্তিত হয়। প্রতিদিনের ব্যবহৃত ভাষায় যেমন, ঠিক তেমনি লোকছড়ায় ও ভাষার এই পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। নোয়াখালীর লোকজীবনে উচ্চারিত ছড়ার মধ্যে এই পরিবর্তন অনেক বেশি দৃশ্যমান। এই প্রবন্ধে ভাষার ধ্বনিগত রূপ-রূপান্তরের সূত্র সাপেক্ষে নোয়াখালীর লোকজ ছড়ায় শব্দের ধ্বনিতাত্ত্বিক পরিবর্তনের দিকটি নির্দেশ করা হয়েছে।

বাংলা লোকসাহিত্যের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হচ্ছে ছড়া। সাহিত্যের এ গুরুত্বপূর্ণ উপাদানটিকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একাধারে 'ছেলে-ভুলানো ছড়া' এবং 'মেয়েলি ছড়া' হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। 'ছেলে ভুলানো ছড়া' এজন্য যে, এগুলো শিশুদের তুষ্ট করার উদ্দেশ্যেই আবৃত্ত হয়; এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে এগুলো শিশুদের মা-খালা-দাদি-নানিদের দ্বারা চর্চিত হয়। তাই এগুলো 'মেয়েলি ছড়া'। আর এসব মা-খালা-দাদি-নানির অধিকাংশই গ্রামের স্বল্পশিক্ষিত কিংবা অশিক্ষিত নারী। তাই তাঁদের ছড়ায় অনুপ্রাস ও ছন্দ-রক্ষার প্রাণান্তকর চেষ্টা পরিলক্ষিত হলেও ছড়াগুলো অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অসংলগ্ন ও অর্থহীন। তবু এগুলোর একটি সর্বজনীন রূপ ও গ্রহণযোগ্যতা রয়েছে।[১] আবার অসংলগ্নতা ও অর্থহীনতা সত্ত্বেও গ্রামীণ নারীরা অত্যন্ত দরদের সাথে রসালো করে ছড়াগুলো আবৃত্তি করেন। মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ এগুলোকে 'সরস প্রাণের জীবন্ত উৎস' আখ্যা দিয়ে লিখেছেন :

> মায়ের সেই ঘুম পাড়ানী গান, সেই খোকা-খুকির ছড়া। এগুলি সরস প্রাণের জীবন্ত উৎস, কিন্তু আজ দুঃখে দৈন্যে প্রাণে সুখ নেই। ছড়াও ক্রমে লোকে ভুলে যাচ্ছে। কে এগুলিকে বইয়ের পাতায় অমর করে রাখবে? (শহীদুল্লাহ, ১৩৩৮ বঙ্গাব্দ)

* সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, নোয়াখালী সরকারি মহিলা কলেজ।

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র প্রত্যাশা অনেকাংশে পূরণ হয়েছে; অনেক ছড়াই আজ শিশু-পাঠ্য পুস্তকে স্থান পেয়েছে। কিন্তু অমরত্ব সর্বাংশে রক্ষিত হয়নি। কারণ, পাঠ্য-পুস্তকের এসব ছড়া অনেক ক্ষেত্রে প্রমিত রূপের আড়ালে তার লোকজ রূপ হারিয়ে ফেলেছে। অবশ্য একথাও সত্য যে, ছড়া লোকসাহিত্যের অংশ এবং কোনো ছড়ারই নির্দিষ্ট রচয়িতা নেই। তাই স্থানভেদে, সময়ভেদে এবং ব্যক্তিভেদে এসবের ধ্বনিগত ও রূপগত পরিবর্তন লক্ষ করা যায়।[২] ছড়া যেহেতু লোকসাহিত্যের উপাদান সেহেতু এগুলো অনেক ক্ষেত্রে লোকজ ভাষা তথা আঞ্চলিক ভাষায় চর্চিত হয়। বাংলা লোকসাহিত্যে ছড়াকে একাধারে 'ছেলে ভুলানো ছড়া' এবং 'মেয়েলি ছড়া' বলা হয়ে থাকে। আর এসব ছেলে তথা শিশুদের বেশির ভাগই গ্রাম বাংলার আলো-বাতাসে বেড়ে ওঠে। তাদের কথা-বার্তা-ক্রিয়া-কলাপে আঞ্চলিক ভাষা মূল অবলম্বন। পড়ালেখার সুবাদে প্রমিত বাংলার সাথে তাদের পরিচয় ও সম্পর্ক ঘটে ধীরে ধীরে। তারা যেসব মা-খালা-দাদি-নানির মুখে ছড়া শোনে তাঁদের বেশির ভাগেরই ভাব প্রকাশের মাধ্যম লোকজ ভাষা তথা আঞ্চলিক ভাষা। আবার অনেক শিশু কেবল মা-খালা-দাদি-নানির মুখে ছড়া শুনে তৃপ্ত হতে পারে না। তারা চায় নিজেরা ইনিয়ে-বিনিয়ে ছড়া কাটতে। তাদের অনেকেই নতুন ছড়ার জন্ম দেয় বটে, কিন্তু শিশুসুলভ উচ্চারণ-আড়ষ্টতার কারণে সেটার কিছু শব্দ নতুন তথা অপ্রচলিত শব্দে পরিণত হয়।[৩] আবার শিশুর মা-খালা-দাদি-নানির মুখে শোনা ছড়া কিংবা তার নিজের তৈরি ছড়া অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অসঙ্গতিপূর্ণ।[৪] এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছেন :

> বালকের প্রকৃতিতে মনের প্রতাপ অনেকটা ক্ষীণ। জগৎসংসার এবং তাহার নিজের কল্পনাগুলি তাহাকে বিচ্ছিন্নভাবে আঘাত করে, একটার পর আর একটা আসিয়া উপস্থিত হয়। মনের বন্ধন তাহার পক্ষে পীড়াজনক। সুসংলগ্ন কার্যকারণ সূত্র ধরিয়া জিনিসকে প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত অনুসরণ করা তাহার পক্ষে দুঃসাধ্য। (রবীন্দ্রনাথ, ১৪০১ বঙ্গাব্দ: ১০৫)

সব মিলিয়ে বাংলার লোকজ ছড়াগুলো যেমন অসঙ্গতিপূর্ণ তেমনি এগুলো আঞ্চলিক, মিশ্র ও পরিবর্তিত ভাষায় চর্চিত।[৫] এসব লোকজ ছড়ার বৈশিষ্ট্য ও গুরুত্ব প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছেন :

> আমাদের ভাষা এবং সমাজের ইতিহাস-নির্ণয়ের পক্ষে সে ছড়াগুলির বিশেষ মূল্য থাকিতে পারে, কিন্তু তাহাদের মধ্যে যে একটি সহজ স্বাভাবিক কাব্যরস আছে, সেইটিই আমার নিকট অধিকতর আদরণীয় বোধ হইয়াছিল। (রবীন্দ্রনাথ, ১৪০১ বঙ্গাব্দ: ১০১)।

এ মন্তব্যের মাঝে লোকজ ছড়ার তিনটি প্রধান দিক প্রকাশ পায়। যথা :

১. ভাষার প্রকৃতি, বিশেষত লোকজ-ভাষার বৈশিষ্ট্য;

২. বাঙালির সমাজ-ব্যবস্থার অতীত ও বর্তমানের বিভিন্ন দিক; এবং

৩. কাব্যরস তথা সাহিত্যমূল্য।

রবীন্দ্রনাথের কাছে ছড়ার কাব্যরস অধিকতর আদরণীয় হলেও এর ভাষার প্রকৃতি তথা লোকজ ভাষা-বৈশিষ্ট্য সহজেই সবার দৃষ্টি কাড়ে। আলোচ্যাংশে নোয়াখালীর কিছু লোকজ ছড়ার ভাষা-বৈশিষ্ট্য এদের প্রমিত রূপ ও সাহিত্যমূল্য সহযোগে তুলে ধরা হলো:

লোকজ ছড়া : ১	প্রমিত রূপ
আ' সৈ সৈ সৈ সৈ ।	আয় সই সই সই সই ।
বিন্নি-দানের খৈ ॥	বিন্নি-ধানের খই ॥
বাই আইসে নাইয়ুর নিতো ।	ভাই এসেছে নাইয়র নিতে ।
সোলতি গোঁড়া লোই ॥	চলতি ঘোড়া নিয়ে ॥

উপরিউক্ত ছড়ায় বিবাহিত গ্রামীণ নারীর শ্বশুরবাড়িতে তার ভাইয়ের আগমন এবং ভাইয়ের সাথে তার বাবার বাড়িতে যাবার আনন্দানুভূতির অগ্রিম প্রকাশ লক্ষ করা যায়। কিন্তু বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলের মতো নোয়াখালী জেলার গ্রামাঞ্চলের এসব নারীর অনেকেই যে বালিকা বধূ, তাদের অনেকেই যে পুতুল খেলার বয়সেই স্বামীর সংসার শুরু করে – এখানে তার একটা ইঙ্গিত রয়েছে। আর শ্বশুরবাড়ি থেকে বাবার বাড়ি যাবার আগে তার সখীদের বলে যাওয়া চাই। তাই সে সখীদের 'সৈ' (soi) সম্বোধন করে বারবার ডাকছে। আবার নোয়াখালী অঞ্চলে গৃহপালিত হাঁসকে খাদ্য গ্রহণের জন্য 'সৈ সৈ সৈ সৈ' বলে ডাকা হয়। এক্ষেত্রে গ্রামীণ নারীর ব্যস্ততা ও তাগিদ সত্ত্বেও নিজের গৃহস্থালি সামলে যাওয়ার আকুতি লক্ষ করা যায়।

অন্যদিকে একসময় অধিকাংশ নারীর বিয়ে হতো অনেক দূরদূরান্তে কিংবা কোনো দূর গাঁয়ে। তাই যাতায়াতের বাহন ছিল নৌকা কিংবা ঘোড়া বা ঘোড়ার গাড়ি। আর চলতি ঘোড়া, অর্থাৎ বলবান বা তেজি ঘোড়া নিয়ে কোনো ভাইয়ের তার বোনকে বাবার বাড়িতে নিতে আসার প্রসঙ্গ পারিবারিক সচ্ছলতার দিকটি নির্দেশ করে। আবার নিজেদের ফসলি জমিতে উৎপন্ন বিন্নি ধানের খই দিয়ে ভাইকে আপ্যায়নের কথা বলা হয়েছে ছড়ার দ্বিতীয় চরণে।

ভাষাতাত্ত্বিক দিক থেকে লক্ষ করা যায় যে, আলোচ্য ছড়ার আ' কথাটি মধ্যম পুরুষের অনুজ্ঞার তুচ্ছার্থক রূপ 'আয়' শব্দের পরিবর্তিত রূপ। 'আয়' দ্বিস্বরধ্বনির (diphthong) 'য়' (y) ধ্বনি লোপ পাওয়ায় নোয়াখালীর আঞ্চলিক ভাষায় তার রূপ হয়েছে 'আ'। 'সৈ সৈ সৈ সৈ' শব্দগুচ্ছ আসলে একই শব্দের পুনঃপুনঃ ব্যবহার। আর শব্দটির ব্যুৎপত্তি হচ্ছে: সখী>সই>সৈ। 'সই' শব্দে palatalization বা তালব্যীভবনের নিয়মে 'স'- এর তালব্য উচ্চারণ (শোই) হলেও 'সৈ' শব্দে 'স' এর dental বা দন্ত্য উচ্চারণ লক্ষ করা যায়। আবার নোয়াখালীর উপভাষায় তালব্য

ধ্বনির স্থলে দন্ত্যধ্বনি উচ্চারিত হওয়ায় ছড়াটির পরবর্তী অংশে 'চ' এবং 'ছ'-এর স্থলে 'স' লেখা হয়েছে। যথা : আইসে (আইছে), সোলতি (চলতি)। আর ব্যাকরণ-বিধি মেনেই এটি করা হয়েছে। জ্যোতিভূষণ চাকী এ প্রক্রিয়াকে 'সকারীভবন' আখ্যা দিয়ে লিখেছেন, "কোথাও বা 'ছ'কে 'স' করে তুলি আমরা। যেমন: গাছতলা>গাসতলা, আগাপাছতলা>আগাপাসতলা। এই ধ্বনি পরিবর্তনকে বলে সকারীভবন (assibilation)।" (জ্যোতিভূষণ, ১৯৯৬ : ৮১) আবার ছড়াটিতে 'দানের' (ধানের) ও 'বাই' (ভাই) শব্দে মহাপ্রাণ ধ্বনি 'ধ' ও 'ভ' যথাক্রমে অল্পপ্রাণ ধ্বনি 'দ' ও 'ব'তে পরিণত হয়েছে। এভাবে মহাপ্রাণ ধ্বনির অল্পপ্রাণ ধ্বনিতে পরিণত হওয়া আঞ্চলিক ভাষায় মহাপ্রাণ ধ্বনির স্বল্পতার পরিসংখ্যান নির্দেশ করে। আর মহাপ্রাণ ধ্বনির অল্পপ্রাণ ধ্বনিতে পরিণত হওয়া প্রসঙ্গে আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ লিখেছেন :

> অনেক সময় রূপমূলস্থিত মহাপ্রাণ ধ্বনি মহাপ্রাণতা হারিয়ে অল্পপ্রাণতা লাভ করে। এর পেছনে একটা ধ্বনিতাত্ত্বিক কারণ বিদ্যমান। মহাপ্রাণ ধ্বনি গঠনের সময় ফুসফুস থেকে বাতাস বের হওয়ার পর বাতাসের প্রবাহ হয় আকস্মিক, কিন্তু যদি বহির্গামী বাতাস শ্বাসনালী দিয়ে ধীরে প্রবাহিত হয়, তাহলে ধ্বনিগুলো মহাপ্রাণতা হারিয়ে ফেলে। (মনজুর মোরশেদ, ১৯৯৭ : ২৪৫-২৪৬)

আলোচ্য ছড়ায় উল্লিখিত ভাষা-বৈশিষ্ট্য ছাড়াও আরো কিছু শব্দের গঠন-প্রক্রিয়া উল্লেখযোগ্য। প্রথমে উল্লেখ্য 'নাইয়ুর' শব্দটি। বিবাহিত নারী বাপের বাড়িতে গেলে তাকে বলে 'নাইয়র'। আর 'নাইয়র' শব্দে মধ্যস্বরাগমের (anaptyxis) নিয়মে অন্ত্যস্থ 'য়' এর সাথে স্বরধ্বনি 'উ' (ু) যুক্ত হওয়ায় নোয়াখালীর আঞ্চলিক ভাষায় তা 'নাইয়ুর' শব্দে পরিণত হয়েছে। নোয়াখালীর আঞ্চলিক ভাষায় শব্দের এ ধরনের রূপান্তরের মধ্যে দ্বিস্বরধ্বনির (diphthong) ব্যবহার বিশেষভাবে লক্ষণীয়। যেমন: 'সৈ', 'খৈ' ও 'লোই' শব্দে 'ওই' (oi) এবং 'বাই' 'আইসে' ও 'নাইয়ুর' শব্দে 'আই' (ai) দ্বিস্বরধ্বনির ব্যবহার লক্ষ করা যায়। দ্বিস্বরধ্বনির এমন ব্যবহার শব্দের উচ্চারণকে যেমন সহজ করেছে তেমন ছড়ার মধ্যে অনুপ্রাস বা ধ্বনিব্যঞ্জনা সৃষ্টি করেছে। এছাড়া অসমাপিকা ক্রিয়া 'নিতে'-এর 'ত'-এর 'এ' ধ্বনি (ে) vowel-gradation বা স্বরের গুণ-বৃদ্ধি-সম্প্রসারণের নিয়মে 'ও' ধ্বনিতে (ো) পরিণত হওয়ায় তা 'নিতো' শব্দে রূপলাভ করেছে। এরপর 'ঘোড়া' শব্দের মহাপ্রাণ ধ্বনি 'ঘ' পূর্বোক্ত নিয়মে অল্পপ্রাণ ধ্বনি 'গ'তে পরিণত হওয়ায় এবং 'গ'-এর 'ও' ধ্বনি (ো) অনুনাসিক স্বরধ্বনিতে পরিণত হওয়ায় শব্দটি 'গোঁড়া' শব্দে পরিণত হয়েছে। মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ স্বরধ্বনির এভাবে অনুনাসিকতা প্রাপ্ত হওয়াকে 'স্বতোনাসিক্যীভবন' বলে অভিহিত করেছেন।[৬] সবশেষে সাধু ভাষার অসমাপিকা ক্রিয়া 'লইয়া' অন্ত্যস্বরলোপের (apothesis) নিয়মে 'লই'– এ পরিণত হয়েছে।

লোকজ ছড়া: ২	প্রমিত রূপ
আঙ্গো হুক্কা বালা ।	আমাদের খোকা ভালো ।
আদরের তালা ॥	আদরের তালা ॥
মা' কয় কুসালা ।	মা বলে কুচালা ।
বা' কয় বিয়া দিয়ালা ॥	বাবা বলে বিয়ে দিয়ে ফেল ॥

ছড়াটিতে পরিবারের ছোট শিশুর প্রতি বড়দের, বিশেষ করে বাবা-মার আদরের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। এতে ছোটো শিশুকে 'বালা' অর্থাৎ, 'ভালো' আখ্যা দিয়ে তাকে তালার সাথে তুলনা করা হয়েছে। আপাত অর্থে এ উপমা জুতসই মনে না হলেও মানুষের মূল্যবান দ্রব্যাদি হেফাজতে রাখার মাধ্যমে মানুষের মনে স্বস্তি ও আনন্দ দানের ক্ষেত্রে তালার ভূমিকা অনস্বীকার্য। তেমনি পরিবারের সবাইকে হাসি-আনন্দে রাখার কাজে ছোট শিশুর ভূমিকা অপরিসীম। আর শিশুর মায়ের তাকে 'কুসালা' (কুচালা) বলে অভিহিত করার ক্ষেত্রে ব্যাজস্তুতি অলঙ্কার অর্থাৎ নিন্দাচ্ছলে প্রশংসা করার প্রবণতা লক্ষ করা যায়। অন্যদিকে বাবার শিশুকে বিয়ে দেওয়ার কথা বলার উদ্দেশ্য নিজে আনন্দ পাওয়া এবং সন্তানকে আনন্দ দেওয়া।

ছড়াটিতে 'আঙ্গো' শব্দটি এসেছে 'আমাগো' শব্দ থেকে। বস্তুত, 'আমা' শব্দের সাথে বহুবচনবাচক ষষ্ঠী বিভক্তি 'দের' যুক্ত হয়ে 'আমাদের' শব্দটি গঠিত হয়েছে। কিন্তু আঞ্চলিক বাংলায় বহুবচনবাচক ষষ্ঠী বিভক্তি 'দের'-এর পরিবর্তে 'গো' যুক্ত হয়ে 'আমাগো' শব্দটি ব্যবহৃত হয়। 'আমাগো' শব্দের 'ম'-এর উদ্বৃত্তস্বর 'আ' (া) মধ্যস্বরলোপের (syncope) সূত্রে উঠে যাওয়ায় নতুন শব্দ হয়েছে 'আমগো'। আর নোয়াখালীর উপভাষায় উচ্চারণ-স্থান-রীতি অনুসারে 'আমগো' শব্দের নাসিক্য ধ্বনি 'ম' 'ঙ'তে পরিণত হয়ে 'আঙ্গো' শব্দে রূপলাভ করেছে। একই ছড়ার 'হুক্কা' শব্দটি এসেছে 'খোকা' শব্দ থেকে। 'খোকা' শব্দের 'ক' ধ্বনিটি ব্যঞ্জনদ্বিত্বের (long-consonant) নিয়মে দ্বিত্ব হয়ে এবং মহাপ্রাণ ধ্বনি 'খ' Sound-change বা ব্যঞ্জন-বিকৃতির নিয়মে অপর মহাপ্রাণ ধ্বনি 'হ'তে পরিণত হয়ে এবং 'খ'-এর উদ্বৃত্তস্বর 'ও' (ে া) vowel-mutation বা স্বরসংকোচনের নিয়মে 'উ' (ু) ধ্বনিতে পরিণত হয়ে 'হুক্কা' শব্দ গঠন করেছে।

আলোচ্য ছড়ার দ্বিতীয় চরণে ভাষাগত কোনো রূপান্তর নেই; এতে কেবল অনুপ্রাস রক্ষিত হয়েছে। তৃতীয় চরণের 'কুসালা' শব্দের ব্যুৎপত্তি এ রকম : কু+চাল+আ= কুচালা > কুসালা। এখানে 'চাল' শব্দের শেষে অন্ত্যস্বরাগম (apothesis)-এর নিয়মে স্বরধ্বনি 'আ' (া) যুক্ত হয়ে এবং শব্দটির আদিতে খাঁটি বাংলা উপসর্গ 'কু' যুক্ত হয়ে 'কুচালা' শব্দটি গঠিত হয়েছে, যার অর্থ দাঁড়ায়: মন্দ বা খারাপ জীবনযাত্রা-পদ্ধতি। নোয়াখালীর উপভাষায় 'কুচালা' শব্দের 'চ' ধ্বনিটি সকারীভবনের সূত্রে

দন্ত্যধ্বনি 'স'তে পরিণত হয়ে 'কুসালা' (kusala) শব্দে রূপান্তরিত হয়েছে। মুহম্মদ আবদুল হাই 'স'কারীভবনের অনুরূপ কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেখিয়েছেন। যেমন: পাঁচ⌒টাকা = পাঁসটাকা, পাঁচ⌒তলা = পাঁস্তলা, নাচতে⌒পারো = নাসতে পারো, পাঁচ⌒থালা = পাঁস্থালা, মাছ⌒টা = মাস্টা, গাছ⌒ঠিকা = গাস্ঠিকা, গাছ⌒তলা = গাস্তলা, গাছ⌒থেকে⌒পাড়া =গাস্থেকেপাড়া। এসব উদাহরণের শেষে তিনি মন্তব্য করেছেন : "ওপরের উদাহরণগুলোতে 'স' উচ্চারিত হয় দাঁত ও দাঁতের গোড়ার মধ্যবর্তী স্থান থেকে। সেজন্য এ 'স'কে দন্ত্য বা অগ্রদন্তমূলীয় (prealveolar) বলা যেতে পারে।" (আবদুল হাই, ১৯৯৮ : ২০৯) শেষ চরণের 'বা' শব্দটি 'বাপ' শব্দ থেকে অন্তর্হতি বা ব্যঞ্জনলোপের সূত্রে গঠিত হয়েছে। অর্থাৎ 'বাপ' শব্দের 'প' ধ্বনিটি লোপ পেয়েছে। অবশ্য এটাও বলা যায় যে, ব্যঞ্জনচ্যুতির নিয়মে 'বাবা' শব্দের শেষের 'ব' ধ্বনি চ্যুত হওয়ায় বা উঠে যাওয়ায় এবং তার উদ্বৃত্তস্বর আ (া) লোপ পাওয়ায় তা 'বা' শব্দে রূপলাভ করেছে। আর 'দিয়ালা' শব্দটি যৌগিক ক্রিয়া 'দিয়া ফেলা' এর পরিবর্তিত রূপ, যা অনুজ্ঞায় মধ্যম পুরুষের তুচ্ছার্থক রূপে ব্যবহৃত হয়। এই 'দিয়া ফেলা' যৌগিক ক্রিয়ারূপের 'ফ' ধ্বনিটি অন্তর্হতি বা ব্যঞ্জনলোপের সূত্রে উঠে গিয়ে এবং তার উদ্বৃত্তস্বর 'এ' (ে) মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ বর্ণিত উপায়ে লুপ্ত হয়ে একত্রে 'দিয়ালা' শব্দটি গঠন করেছে। (শহীদুল্লা, ২০০২/৩ : ৭৮)

লোকজ ছড়া : ৩	**প্রমিত রূপ**
আঁর নাম হাঁসকড়ি।	আমার নাম পাঁচকড়ি।
কইলে কইবেন গফ করি ॥	বললে বলবেন গল্প করি ॥
তালগাস্ আঁর আতের লাডি।	তালগাছ আমার হাতের লাঠি।
শুয়ারি গাস্ দি' খিলাইল করি ॥	সুপারি গাছ দিয়ে খিলাল করি ॥
সোইল্সিলাম মোঙ্গলে।	চলেছিলাম মঙ্গলে।
যাই' উইড্লাম জঙ্গলে ॥	গিয়ে উঠলাম জঙ্গলে ॥
জঙ্গলে দেইক্লাম হাঁফ।	জঙ্গলে দেখলাম সাপ।
হাঁফেরে মাইল্লাম লাতি।	সাপকে মারলাম লাথি।
ওই গেলো অ্যাক আঁতি ॥	হয়ে গেলো এক হাতি ॥
আঁতির হিডে করি' হোর বাইত যাই।	হাতির পিঠে করে শ্বশুর বাড়িতে যাই।
সোড হালায় আব্বা বোলায় খুঁশির শিমা নাই ॥	ছোট শালায় আব্বা ডাকে খুশির সীমা নাই ॥

ছড়াটির আদ্যন্ত গ্রামীণ মানুষের বাগাড়ম্বরের দিকটি লক্ষ করা যায়। অলঙ্কার-বিচারে এটি 'অতিশয়োক্তি' অলঙ্কারের দৃষ্টান্ত।[৭] প্রথম দুই চরণে 'হ্যাঁ' কে 'না' বলার যে চেষ্টা লক্ষ করা যায় সে বিবেচনায় একে 'বক্রোক্তি' অলঙ্কারের দৃষ্টান্ত বলেও অভিহিত করা যায়।

উল্লিখিত ছড়ার বেশির ভাগ শব্দেরই ধ্বনিগত পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। প্রথম চরণের 'আঁর' এবং হাঁস' শব্দে নাসিক্য ধ্বনির পরিবর্তে এবং পরবর্তী 'হাঁফ', 'আঁতি' ও 'খুঁশির' শব্দে স্বতোনাসিক্যীভবনের সূত্রে ধ্বনির অনুনাসিকতা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এক্ষেত্রে 'আমার' শব্দের নাসিক্য ধ্বনি 'ম'-এর পরিবর্তে 'আ' অনুনাসিকতা লাভ করায় নতুন শব্দ হয়েছে 'আঁর'। অনুরূপভাগে তৎসম 'পঞ্চ' শব্দের 'ঞ্চ' এর পরিবর্তে 'প'-এর 'অ' ধ্বনি অনুনাসিকতা প্রাপ্ত হওয়ায় এবং আদিস্বরের বৃদ্ধির নিয়মে 'অ' ধ্বনি 'আ' ধ্বনিতে পরিণত হওয়ায় নতুন শব্দ হয়েছে 'পাঁচ'। নোয়াখালীর আঞ্চলিক ভাষায় 'পাঁচ' শব্দের 'প' ধ্বনিটি sound-change বা ব্যঞ্জন-বিকৃতির নিয়মে 'হ' ধ্বনিতে পরিণত হয়ে এবং তালব্য ধ্বনি 'চ' সকারীভবনের সূত্রে 'স'তে পরিণত হয়ে 'হাঁস্' (*has*) শব্দে পরিণত হয়েছে। সকারীভবনের অনুরূপ দৃষ্টান্ত লক্ষ করা যায় 'গাস' শব্দে। যেমন : গাছ > গাস।

এরপর স্বতোনাসিক্যীভবনের সূত্রে 'হাঁফ', 'আঁতি' 'খুঁশির' শব্দে 'আ' ধ্বনি অনুনাসিক স্বরধ্বনিতে পরিণত হয়েছে। এক্ষেত্রে প্রমিত বাংলার 'সাপ' শব্দের 'স' ধ্বনিটি ব্যঞ্জন-বিকৃতির (sound-change) নিয়মে 'হ' ধ্বনিতে পরিণত হওয়ায় এবং 'প' ধ্বনিটি মহাপ্রাণতা (aspiration) প্রাপ্ত হয়ে 'ফ'তে পরিণত হওয়ায় শব্দটির 'হাঁফ' শব্দে রূপান্তর ঘটেছে। এছাড়া 'হাতি' শব্দের 'হ' ধ্বনিটি অন্তর্হতি বা ব্যঞ্জন-লোপের সূত্রে উঠে গেলেও তার উদ্বৃত্তস্বর 'আ' অটুট থেকে এবং 'আ' অনুনাসিক স্বরধ্বনিতে পরিণত হয়ে 'আঁতি' শব্দটি গঠন করেছে। ধ্বনির অনুনাসিকতার পর আলোচ্য ছড়ায় 'হ' কার লোপ পাওয়ার ব্যাপারটি লক্ষণীয়। সাধারণত 'হ' কার লোপ পাওয়ার বিষয়টি শব্দের আদিতে মাঝে ও অন্তে সমভাবে লক্ষ করা গেলেও আলোচ্যাংশে শব্দের আদিতে ও মাঝে 'হ' কার লোপের বিষয়টি লক্ষ করা যায়। আর আলোচ্য ছড়ায় 'হ'কার লোপ পাওয়ার ফলে গঠিত শব্দগুলোর ব্যুৎপত্তি এ রকম : কহিলে > কইলে, কহিবেন > কইবেন, হাতের > আতের, হোই < হোইয়া>ওই, হাতি > আঁতি। এক্ষেত্রে লক্ষণীয় : প্রতিটি উদাহরণে 'হ'কার লোপ পেলেও তার উদ্বৃত্তস্বর অটুট রয়েছে। আলোচ্য ছড়ার অন্যান্য শব্দের মধ্যে 'গফ' শব্দ গঠিত হয়েছে এভাবে: গল্প>গপ্প>গপ>গফ। এক্ষেত্রে 'গল্প' শব্দের 'ল' ধ্বনিটি gemination বা যুগ্মীভবনের সূত্রে পরের ধ্বনি 'প' এর সাথে সমতা প্রাপ্ত হওয়ায় শব্দটির নতুন রূপ হয়েছে 'পপ্প'। এরপর ব্যঞ্জনচ্যুতির সূত্রে একটি 'প' লোপ পাওয়ায় নতুন শব্দ হয়েছে 'গপ্'। এরপর 'প' ধ্বনিটি মহাপ্রাণতা প্রাপ্ত হওয়ায় শব্দটি 'গফ' শব্দে পরিণত হয়েছে। 'লাডি' শব্দটি এসেছে 'লাঠি' থেকে। এক্ষত্রে মহাপ্রাণ ধ্বনির অল্পপ্রাণ ধ্বনিতে পরিণত হবার পাশাপাশি ঘোষীভবনের (voicing) সূত্রে অঘোষ ধ্বনি (vioceless) 'ঠ' ঘোষধ্বনি (voiced) 'ড'তে পরিণত হয়েছে। অনুরূপভাবে অঘোষ মহাপ্রাণ ধ্বনি 'ঠ' ঘোষ অল্পপ্রাণ ধ্বনি 'ড'তে পরিণত হয়ে এবং ব্যঞ্জন-বিকৃতির (sound-change) নিয়মে 'প' ধ্বনিটি 'হ' ধ্বনিতে পরিণত হওয়ায় 'পিঠে' শব্দটি

হয়েছে 'হিডে'। আর 'ছোট' শব্দের 'ছোড' শব্দে পরিণত হবার ক্ষেত্রে ধ্বনির অল্পপ্রাণতা বজায় থাকলেও ঘোষীভবনের নিয়মে অঘোষ ধ্বনি 'ট' ঘোষধ্বনি 'ড'তে পরিণত হয়েছে। আলোচ্য ছড়ায় আঞ্চলিক ভাষায় রূপান্তরিত অন্যান্য শব্দের ব্যুৎপত্তি এভাবে ঘটেছে : শুয়ারি < শুপারি, দি' < দিয়ে, খিলাইল<খিলাল, সোইলসিলাম < চলিয়াছিলাম, উইডলাম < উঠিলাম, দেইক্‌লাম <দেখিলাম, মাইল্‌লাম < মারিলাম, লাতি < লাথি, হোর < শ্বশুর (শোশুর), বাইত < বাড়িতে, হালায় < শালায়, বোলায় < বোল্ + আয়। এক্ষেত্রে 'শুপারি' শব্দের 'প' ধ্বনি অন্তর্হতি বা ব্যঞ্জনলোপের সূত্রে লোপ পেলেও তার উদ্বৃত্তস্বর অটুট রয়েছে এবং তালব্যীভবনের (palatalization) সূত্রে দন্ত্য 'স' তালব্য 'শ'তে পরিণত হয়েছে। 'দিয়ে' শব্দের অন্তস্থ্য 'য়' লোপ পেয়ে হয়েছে দি'। মধ্যস্বরাগমের (anaptyxis) নিয়মে আরবি 'খিলাল' শব্দে স্বরধ্বনি 'ই' যুক্ত হয়ে হয়েছে 'খিলাইল'। চলিয়াছিলাম, উঠিলাম ও দেখিলাম শব্দের স্বরধ্বনি 'ই'(ি) অপিনিহিতির (apenthesis) সূত্রে আগে উচ্চারিত হয়েছে। এছাড়া সকারীভবনের (assibilation) সূত্রে 'চলিয়াছিলাম' শব্দের 'চ' ও 'ছ' 'স'তে পরিণত হয়েছে। আর 'উঠিলাম'-এর 'ঠ' ধ্বনিটি ঘোষীভবনের সূত্রে 'ড'তে পরিণত হয়েছে এবং 'দেখিলাম'-এর মহাপ্রাণ ধ্বনি 'খ' অল্পপ্রাণ ধ্বনি 'ক'তে পরিণত হয়েছে। 'লাথি' শব্দের মহাপ্রাণ ধ্বনি 'থ' অল্পপ্রাণ ধ্বনি 'ত'তে পরিণত হয়েছে। আঞ্চলিক ভাষা উচ্চারণ-নির্ভর হওয়ায় শ্বশুর-এর শুদ্ধ উচ্চারণের রূপ 'শোশুর' থেকে 'হোর' শব্দের উদ্ভব ঘটেছে। এক্ষেত্রে 'শোশুর'-এর প্রথম 'শ'টি ব্যঞ্জন-বিকৃতির নিয়মে 'হ'তে পরিণত হয়ে এবং দ্বিতীয় 'শ' ও তার উদ্বৃত্তস্বর 'উ' লোপ পেয়ে নতুন শব্দ হয়েছে 'হোর'। অন্তর্হতির নিয়মে 'বাড়িতে' শব্দের 'ড়' এবং অন্ত্যস্বরলোপের (apocope) সূত্রে 'ত'-এর 'এ' ধ্বনি (ে) লোপ পাওয়ায় শব্দটি 'বাইত' শব্দে পরিণত হয়েছে। এছাড়া 'শ' ব্যঞ্জনবিকৃতির নিয়মে 'হ'তে পরিণত হওয়ায় 'শালায়' হয়েছে 'হালায়'। আর 'মারিলাম' শব্দের 'র'কার লোপ পেয়ে এবং পরবর্তী ব্যঞ্জনধ্বনি 'ল' দ্বিত্ব হয়ে নতুন শব্দ হয়েছে 'মাইল্লাম'।[৮] আর বোল শব্দের সাথে 'আয়' প্রত্যয় যুক্ত হওয়ায় নামপুরুষের নামধাতুর ক্রিয়া হয়েছে 'বোলায়'।

লোকজ ছড়া : ৪	প্রমিত রূপ
আঁশ হালি কোইতর হালি।	হাঁস পালি কবুতর পালি।
আরো হালি টিঁয়া ॥	আরো পালি টিয়া ॥
এই সিঁড়ি লেইক্‌সি আঁই।	এই চিঠি লিখেছি আমি।
মোশার কামড় খাইয়া ॥	মশার কামড় খেয়ে ॥
তুঁই বোন্দু হোইড়বা সিঁডি।	তুমি বন্ধু পড়বে চিঠি।
মুশির টানাইয়া ॥	মশারি টাঙিয়ে ॥

আলোচ্য ছড়ার প্রথমে একাধারে নোয়াখালী অঞ্চলের গ্রামীণ নারীর প্রাত্যহিক জীবনের কর্মকাণ্ড এবং বিরহকাতরতার দিকটি প্রকাশ পেয়েছে। এরপর মশার কামড় খেয়ে চিঠি লেখার প্রসঙ্গটিতে একাধারে আর্থিক অসচ্ছলতা অর্থাৎ, মশারি কেনার সামর্থ্য না থাকা এবং প্রিয়জনকে প্রেমতৃষাতুর করে তোলার চাতুর্য প্রকাশ পায়। হতে পারে বাস্তবে চিঠিটি সে আদৌ মশার কামড় খেয়ে লেখেনি। আর নিজে মশার কামড় খেলেও নিজের প্রেমাস্পদকে যেন মশার কামড়ের যন্ত্রণা ভোগ করতে না হয় সেই সতর্কতাই লক্ষ করা যায় ছড়ার শেষাংশে।

ছড়াটিতে 'আঁশ' শব্দে নাসিক্য ধ্বনি অনুস্বারের (ং) পরিবর্তে এবং চলতি বাংলার 'আমি' সর্বনামের অনুনাসিকতার সাদৃশ্যে 'আঁই' রূপমূল, 'তুঁই' শব্দে নাসিক্য ধ্বনি 'ম' এর পরিবর্তে এবং 'টিয়া' ও 'সিঁড়ি' শব্দে স্বতোনাসিক্যীভবনের সূত্রে মৌখিক স্বরধ্বনি 'ই' অনুনাসিকতা ('ইঁ') লাভ করেছে। তৎসম 'হংস' শব্দের নাসিক্য ধ্বনি অনুস্বার অনুনাসিক হওয়ায় নতুন শব্দ হয়েছে 'হাঁস'। আর হাঁস' শব্দের 'হ'কার লোপ পেয়ে, 'হ'-এর উদ্বৃত্তস্বর 'আ' অটুট থেকে এবং দন্ত্য 'স' তালব্যীভবনের (palatalization) সূত্রে তালব্য 'শ'তে পরিণত হয়ে 'আঁশ' শব্দে পরিণত হয়েছে। 'আঁই', 'তুঁই' শব্দ দুটিতে নাসিক্য ধ্বনি 'ম'-এর পরিবর্তে যেমন 'আ' ধ্বনি অনুনাসিক ধ্বনিতে (আঁ) পরিণত হয়েছে তেমনি তাদের উদ্বৃত্তস্বর 'ই' অটুট রয়েছে। 'পালা' ক্রিয়াপদের উত্তম পুরুষের বর্তমান কালের রূপ 'পালি'। আর 'পালি'-এর 'প' ধ্বনিটি ব্যঞ্জন-বিকৃতির (sound-change) নিয়মে 'হ' ধ্বনিতে পরিণত হওয়ায় নতুন শব্দ হয়েছে 'হালি'। মহাপ্রাণিত (aspirated) হওয়া এবং 'র'ফলা (্র) লোপ পাওয়া ছাড়াও নোয়াখালীর আঞ্চলিক ভাষায় 'প' ধ্বনির 'হ' ধ্বনিতে পরিণত হওয়া অনেকটা স্বাভাবিক। যেমন: পড়া>হড়া, পাট>হাট, পানি>হানি, পাপ>হাফ, পাগল>হাগল, পোলা>হোলা ইত্যাদি। মহাপ্রাণিত হওয়ার এবং 'র'ফলা লোপ পাওয়ার অনুরূপ দৃষ্টান্ত পেঁপে>ফেফে, প্রশ্রয়>ফসরয়, প্রথম>ফতম ইত্যাদি। 'কবুতর' শব্দের 'ব' ধ্বনিটি অন্তর্হতি বা ব্যঞ্জনলোপের সূত্রে উঠে গিয়ে এবং তার উদ্বৃত্তস্বর 'উ' (ু) স্বর-সংকোচন বা vowel-mutation-এর নিয়মে 'ই'তে পরিণত হয়ে 'কইতর' শব্দে পরিণত হয়েছে। কিন্তু আঞ্চলিক ভাষা কেবল উচ্চারণ-নির্ভর হওয়ায় এবং সংবৃত উচ্চারণের কারণে শব্দটির বানান দেখানো হয়েছে 'কোইতর' হিসেবে। 'লেইকসি' শব্দটি এসেছে 'লিখিয়াছি' শব্দ থেকে। এক্ষেত্রে মহাপ্রাণ ধ্বনি 'খ' অল্পপ্রাণ ধ্বনি 'ক'তে পরিণত হয়েছে। 'খ'-এর 'ই' ধ্বনি (ি) অপিনিহিতির (apenthesis) সূত্রে আগে উচ্চারিত হয়েছে এবং 'ছ' ধ্বনিটি সকারীভবনের সূত্রে 'স'তে পরিণত হয়েছে। 'হোইড়বা' শব্দ এসেছে 'পড়িবা' শব্দ থেকে, যার উচ্চারণ 'পোড়িবা'। এই 'পোড়িবা'র 'প' ধ্বনি ব্যঞ্জন-বিকৃতির নিয়মে 'হ' ধ্বনিতে পরিণত হয়ে এবং 'ড়'-এর 'ই' ধ্বনি (ি) অপিনিহিতির সূত্রে আগে উচ্চারিত হয়ে 'হোইড়বা' শব্দে পরিণত হয়েছে। 'মোশার' ও 'মুশির' শব্দে স্বরের গুণ-বৃদ্ধি-সম্প্রসারণের (vowel-

gradation) নিয়মে 'ম'-এর 'অ' ধ্বনি যথাক্রমে 'ও' (ো) এবং 'উ' ধ্বনিতে (ু) পরিণত হয়েছে। আর 'মশারি' শব্দের 'ই' ধ্বনি অপিনিহিতির সূত্রে আগে উচ্চারিত হয়ে 'শ'-এর আগে বসায় নতুন শব্দ হয়েছে 'মুশির'।

লোকজ ছড়া : ৫	প্রমিত রূপ
ইলিশ মাসের তিরিশ কাঁডা।	ইলিশ মাছের ত্রিশ কাঁটা।
বোয়াল মাসের দাঁড়ি ॥	বোয়াল মাছের দাড়ি ॥
জরিনারে নিতো আইসে।	জরিনারে নিতে এসেছে।
রংফুরের গাঁড়ি ॥	রংপুরের গাড়ি ॥

উপরের ছড়ায় বাঙালির প্রিয় মাছের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দুটি মাছ, যা নোয়াখালীতে ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে সহজলভ্য, তা দিয়ে অতিথি আপ্যায়নের ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে ইলিশ মাছ রূপে ও স্বাদে অতুলনীয়। আর বোয়াল মাছ আকারে যেমন বড় তেমনি সুস্বাদু। আবার এর রয়েছে দাড়ি সদৃশ লম্বা শুঁড়। জরিনাকে নেওয়ার জন্য রংপুরের গাড়ির নোয়াখালীতে আসার কথা নয়। কারণ 'রংপুরের গাড়ি' বলতে তো কেবল গরুর গাড়িকেই বোঝানো হতো। তবে সেকালে নারীদের যে অনেক দূরদূরান্তে বিয়ে দেওয়া হতো সে কথাই এখানে বোঝানো হয়েছে। আবার হতে পারে, যে জরিনাকে রংপুরের গাড়ি নিতে আসার কথা বলা হয়েছে সে জরিনার হয়তো বিয়েই হয়নি; হতে পারে সে এখনো কিশোরী কিংবা শিশু। বান্ধবী কিংবা বড়রা কেবল আনন্দ দেওয়া ও নেওয়ার জন্যই জরিনাকে এ সংবাদ দিচ্ছে।

সকারীভবনের (assibilation) নিয়মে ছড়াটির প্রমিত রূপের 'মাছের' ও 'আসিয়াছে' শব্দের 'ছ' ধ্বনিটি 'স'তে পরিণত হওয়ায় শব্দ দুটির নতুন রূপ হয়েছে যথাক্রমে 'মাসের' (maser) ও 'আইসে' (aise)। আর 'আসিয়াছে' শব্দের 'ই' ধ্বনি (ি) অপিনিহিতির (apenthesis) সূত্রে আগে উচ্চারিত হওয়ায় এবং অর্ধস্বর 'য়' (y) ও তার উদ্বৃত্তস্বর 'আ' (া) লোপ পাওয়ায় শব্দটির নতুন রূপ হয়েছে 'আইসে'। মধ্যস্বরাগমের (anaptyxis) নিয়মে স্বরধ্বনি 'ই' (ি) যুক্ত হওয়ায় 'ত্রিশ' হয়েছে 'তিরিশ' (tirish)। এক্ষেত্রে রূপমূলের প্রথমে সংযুক্ত ব্যঞ্জন 'ত্র' অসংযুক্ত ব্যঞ্জনে (ত+র) পরিণত হয়েছে। 'কাঁডা' শব্দের ব্যুৎপত্তি হচ্ছে: কণ্টক> কাঁটা> কাঁডা। তৎসব 'কণ্টক' শব্দের নাসিক্য ধ্বনি 'ণ'-এর পরিবর্তে 'ক'-এর 'অ' ধ্বনি অনুনাসিক হওয়ায় শব্দটি 'কাঁটা' শব্দে পরিণত হয়েছে।[৯] নোয়াখালীর উপভাষায় 'কাঁটা' শব্দের 'ট' ধ্বনিটি voicing বা ঘোষীভবনের সূত্রে 'ড'তে পরিণত হওয়ায় শব্দটির রূপ হয়েছে 'কাঁড়া'। 'দাঁড়ি' ও 'গাঁড়ি' শব্দে স্বতোনাসিক্যীভবনের নিয়মে 'আ' স্বরধ্বনি অনুনাসিকতা প্রাপ্ত হয়েছে। "জরিনারে নিতো আইসে"–এ চরণে অসমাপিকা ক্রিয়া

'নিতে'র 'এ' ধ্বনি (ে) vowel-gradation বা স্বরের গুণ-বৃদ্ধি-সম্প্রসারণের নিয়মে 'ও' ধ্বনিতে (ো) পরিণত হয়ে 'নিতো' শব্দে রূপান্তরিত হয়েছে। আর 'রংপুরের' অল্পপ্রাণ ধ্বনি 'প' মহাপ্রাণ ধ্বনি 'ফ'তে পরিণত হওয়ায় শব্দটির নতুন রূপ হয়েছে 'রংফুরের'। এভাবে অল্পপ্রাণ ধ্বনির মহাপ্রাণ ধ্বনিতে পরিণত হওয়া প্রসঙ্গে আবুল কালাম মনজুর মোরশেদের মন্তব্য উল্লেখযোগ্য। তিনি লিখেছেন, "উচ্চারণ পদ্ধতির পরিবর্তনজনিত কারণে স্পৃষ্টধ্বনি উষ্ম শিসধ্বনি অথবা ঘৃষ্টধ্বনিতে, মহাপ্রাণ ধ্বনি অল্পপ্রাণ ধ্বনিতে, অথবা অল্পপ্রাণ ধ্বনি মহাপ্রাণ ধ্বনিতে পরিবর্তিত হয়ে থাকে।" (মনজুর মোরশেদ, ১৯৯৬ : ১৭)

লোকজ ছড়া : ৬	প্রমিত রূপ
একসের সাইলের বাত রাইনছি বরকতে।	একসের চালের ভাত রেঁধেছি বরকতে।
হুঁনা গড়ে মাস দইচ্ছি কিসমতে ॥	শুকনা গড়ে মাছ ধরেছি কিসমতে ॥
বুড়িয়ার কাসে বিয়া বইসি বরাতে।	বুড়োর কাছে বিয়ে বসেছি বরাতে।
বুড়িয়া ব্যাডার কিল খাইসি ম্যাক্করে ॥	বুড়ো ব্যাটার কিল খেয়েছি মেকি করে ॥

ছড়াটিতে গ্রামের দরিদ্র মানুষের সংসার জীবনের টানাপড়েন এবং পারিবারিক কলহের চিত্র ফুটে উঠেছে। আর পারিবারিক কলহের মূলে রয়েছে একদিকে আর্থিক অনটন অন্যদিকে স্বামী-স্ত্রীর বয়সের ব্যবধান-হেতু মানসিক দূরত্ব। এর মধ্য দিয়ে গ্রামীণ সমাজের নারীদের বাল্য-বিবাহের এবং অধিক বয়স্ক লোকের সাথে বিবাহের দিকটি ফুটে উঠেছে। আলোচ্য ছড়ায় কোনো যুবতীর বৃদ্ধ লোকের সাথে বিয়ে হওয়া অস্বাভাবিক না হলেও শুকনা গড়ে মাছ ধরার বিষয়টি একেবারেই অস্বাভাবিক।

ছড়াটিতে সাইলের, রাইনসি, মাস, কাসে, বইসি ও খাইসি শব্দে সকারীভবনের (assibilation) সূত্রে প্রমিত রূপের 'চ' ও 'ছ' ধ্বনি আঞ্চলিক রূপে 'স'তে পরিণত হয়েছে। সকারীভবনের পাশাপাশি মধ্যস্বরাগামের (anaptyxis) নিয়মে স্বরধ্বনি 'ই' যুক্ত হওয়ায় 'চালের' শব্দটি হয়েছে 'সাইলের'। শব্দটির ব্যুৎপত্তি এমনঃ চাউল (chaul)>চাইল (chail)> সাইল (sail)> সাইল+এর= সাইলের। মহাপ্রাণ ধ্বনি 'ভ' অল্পপ্রাণ ধ্বনি 'ব'তে পরিণত হওয়ায় 'ভাত' শব্দটি হয়েছে 'বাত'। 'রান্ধিয়াছি' শব্দের 'ছ' ধ্বনিটি সকারীভবনের সূত্রে 'স'তে পরিণত হবার পাশাপাশি 'ধ' ধ্বনিটি অন্তর্হতি বা ব্যঞ্জনলোপের সূত্রে লোপ পেয়ে, তার উদ্বৃত্তস্বর 'ই' বহাল থেকে এবং অপিনিহিতির সূত্রে আগে উচ্চারিত হয়ে 'রাইনসি' শব্দে পরিণত হয়েছে। শব্দটির ব্যুৎপত্তি এমনঃ রান্ধিয়াছি (randiachi)> রাঁধছি (r̃adchi)> রাইনসি (rainsi)। 'হুঁনা' শব্দটি এসেছে 'শুকনা' শব্দ থেকে। এক্ষেত্রে উষ্মধ্বনি 'শ' ঘোষীভবনের (voicing) সূত্রে উষ্ম ঘোষধ্বনি 'হ'তে পরিণত হয়েছে এবং 'ক' ধ্বনিটি অন্তর্হতি বা ব্যঞ্জনলোপের সূত্রে লোপ পেয়েছে। 'দইচ্ছি' শব্দটি এসেছে 'ধরিয়াছি'

শব্দ থেকে। এর মহাপ্রাণ ধ্বনি 'ধ' অল্পপ্রাণ ধ্বনি 'দ'তে পরিণত হয়েছে। অর্ধস্বরধ্বনি অন্তঃস্থ 'য়' এবং 'র'কার লোপের সূত্রে 'র' ধ্বনিটি লোপ পেয়েছে এবং 'র'-এর উদ্বৃত্তস্বর 'ই' বহাল রয়েছে। আর 'র'কার লোপ পাওয়ায় পরবর্তী ব্যঞ্জনধ্বনি 'ছ' বা যুগ্মীভবনের নিয়মে দ্বিত্ব হয়েছে। এক্ষেত্রে বাংলা যুক্তবর্ণে একই মহাপ্রাণ ধ্বনি পাশাপাশি দুবার উচ্চারিত হবার রীতি না থাকায় 'ছ'-এর আগে তার অল্পপ্রাণ ধ্বনি 'চ' হয়েছে। 'বইসি' শব্দটি সাধু ভাষার ক্রিয়াপদ 'বসিয়াছি' থেকে এসেছে। 'বসিয়াছি' শব্দের অর্ধস্বর অন্তঃস্থ 'য়' (y) এবং ব্যঞ্জনধ্বনি 'স' লোপ পেয়েছে এবং 'স'-এর উদ্বৃত্তস্বর 'ই' অটুট রয়েছে। শব্দটির ব্যুৎপত্তি এরূপ : বসিয়াছি (bosiachi)> বইসি (boisi)। 'ব্যাডার' মানে 'ব্যাটার'। এখানে ঘোষীভবনের (voicing) সূত্রে অঘোষ ধ্বনি 'ট' ঘোষধ্বনি 'ড'তে পরিণত হয়েছে। 'খাইসি' শব্দটি এসেছে 'খাইয়াছি' শব্দ থেকে। এক্ষেত্রে অর্ধস্বর 'য়' লোপ পেয়েছে এবং সকারীভবনের সূত্রে 'ছ' 'স'তে পরিণত হয়েছে। আর 'ম্যাক্করে' শব্দটি 'মেকি করে' শব্দযুগলের একীভূত রূপ। এক্ষেত্রে 'ম'-এর 'এ' ধ্বনি (ে) বিবৃত উচ্চারণ ধারণ করায় 'ম্যা'তে পরিণত হয়েছে। আর 'ক'-এর 'ই' ধ্বনি (ি) সম্প্রকর্ষ বা স্বরলোপের সূত্রে উঠে গেছে।

লোকজ ছড়া : ৭	প্রমিত রূপ
অ্যাঁতের বান ব্যাতের বান।	আঁতের (নাড়ির) বাঁধন, বেতের বাঁধন।
গব্গবাইয়া সুরা আন।।	অঝোর ধারায় বৃষ্টি আন।।
ওক্গা শুয়ারির দুগা গোট।	একটা সুপারির দুইটা গোটা।
ঠাঁডাবাঙা রোইদ উট্।।	বজ্রপাতের পর রোদ উঠ্।।

ছড়াটিতে বৃষ্টিকে আহ্বান করা হয়েছে। এমন বৃষ্টি, যে বৃষ্টি অঝোরে ঝরবে এবং বৃষ্টির শেষে চারদিকে আলো-ঝলমলে রোদ উঠবে। আর এমন রোদ, যার উত্তাপে সুপারির গোট, অর্থাৎ আস্ত সুপারি দ্বিখণ্ডিত হয়ে যাবে। আর আলোচ্য ছড়ার প্রথম চরণে 'বান' শব্দটি দুবার ব্যবহারের দ্বারা অনুপ্রাস সৃষ্টি করা হয়েছে।

বাংলা 'বান' শব্দটি এসেছে 'বন্ধন' শব্দ থেকে, যার অর্থ গিঁট। শব্দটির ব্যুৎপত্তি এ রকম : বন্ধন > বাঁধন >বাঁধ>বান। অ্যাঁত শব্দটি এসেছে 'আঁত' শব্দ থেকে, যার অর্থ নাড়ি। শব্দটির 'আ' ধ্বনি 'স্বরধ্বনির গুণ-বৃদ্ধি-সম্প্রসারণের নিয়মে 'অ্যা' ধ্বনিতে পরিণত হয়েছে। তাই 'অ্যাঁতের বান' মানে 'আঁতের বন্ধন', আর 'ব্যাতের বান' মানে 'বেতের বন্ধন'। এক্ষেত্রে 'ব্যাতের' শব্দের 'ব'-এর 'এ' ধ্বনি (ে) বিবৃত উচ্চারণ ধারণ করেছে। তবে 'বান' শব্দের প্রথম অর্থ ধরে বলা যায় যে, বন্যাকে আবাহনের পাশাপাশি পরের চরণের সাথে অন্ত্যানুপ্রাস সৃষ্টি এবং প্রথম চরণে অনুপ্রাস বা ধ্বনিব্যঞ্জনা সৃষ্টির জন্য শব্দটির ব্যবহার হয়েছে। 'গবগব' কথাটি অনুকার বা

ধ্বন্যাত্মক অব্যয় হলেও 'গবগবাইয়া' শব্দটি ক্রিয়া-বিশেষণ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। 'সুরা' শব্দটি গঠিত হয়েছে এভাবে: চুর+আ= চুরা>সুরা। এক্ষেত্রে সকারীভবনের (assibilation) নিয়মে 'চ' 'স'তে পরিণত হয়েছে। 'চুর' মানে চূর্ণ, বিধ্বস্ত, বিনষ্ট ইত্যাদি। নোয়াখালীর আঞ্চলিক ভাষায় 'সুরা' শব্দটি অর্থ পরিবর্তনের (semantic change) নিয়মে 'অঝোর বৃষ্টি' অর্থে ব্যবহৃত হয়।[১০] 'ওকগা' শব্দটি এসেছে 'একটা' শব্দ থেকে। এক্ষেত্রে 'একটা' শব্দের 'এ' ধ্বনিটি vowel-gradation বা স্বরের গুণ-বৃদ্ধি-সম্প্রসারণের নিয়মে 'ও'তে পরিণত হয়েছে। আর পদাশ্রিত নির্দেশক 'টা' এর 'ট' ধ্বনিটি ব্যঞ্জন-বিকৃতির নিয়মে 'গ'তে পরিণত হয়েছে। আঞ্চলিক ভাষা উচ্চারণ-নির্ভর হওয়ায় 'সুপারি' শব্দের দন্ত্য 'স' তালব্য 'শ'তে পরিণত হয়েছে। অবশ্য এটাও বলা যেতে পারে যে, palatalization বা তালব্যীভবনের সূত্রে দন্ত্য 'স' তালব্য 'শ'তে পরিণত হয়েছে। আর 'প' ধ্বনিটি অন্তর্হতি বা ব্যঞ্জনলোপের সূত্রে উঠে গেলেও তার উদ্বৃত্তস্বর 'আ' (া) অটুট থাকায় 'সুপারির' স্থলে হয়েছে 'শুয়ারির'। 'দুগা' শব্দটি এসেছে মূলত 'দুইটা' শব্দ থেকে। 'দুইটা' শব্দের 'ই' স্বরধ্বনিটি মধ্যস্বরলোপের (syncope) সূত্রে লোপ পেয়ে এবং 'ট' ধ্বনিটি ব্যঞ্জন-বিকৃতির নিয়মে 'গ'তে পরিণত হয়ে 'দুগা' শব্দে রূপলাভ করেছে। 'গোট' শব্দটি এসেছে 'গোটা' থেকে। 'গোটা' শব্দের 'ট' এর 'আ' ধ্বনি (া) অন্ত্যস্বরলোপের (apocope) সূত্রে লোপ পেয়েছে। 'ঠাঁডা' শব্দটি এসেছে ইংরেজি 'thunder' শব্দ থেকে, যার অর্থ 'বজ্রধ্বনি'। শব্দটির বাংলা প্রতিবর্ণিকরণ করলে এর রূপ দাঁড়ায় 'থান্ডার'। এর দন্ত্য মহাপ্রাণ ধ্বনি 'থ' cerebralization বা মূর্ধন্যীভবনের সূত্রে মূধন্য মহাপ্রাণ ধ্বনি 'ঠ'তে পরিণত হয়ে, নাসিক্য ধ্বনি 'ন' লোপ পাওয়ায় 'থা'-এর 'আ' ধ্বনি আনুনাসিকতা প্রাপ্ত হয়ে এবং 'r' ধ্বনিটি অন্তর্হতি বা ব্যঞ্জনলোপের সূত্রে লোপ পেয়ে নোয়াখালীর আঞ্চলিক ভাষায় 'ঠাঁডা' শব্দে পরিণত হয়েছে।[১১] 'ভাঙ্গা' শব্দের মহাপ্রাণ ধ্বনি 'ভ' অল্পপ্রাণ ধ্বনি 'ব'তে এবং 'ঙ' 'ঙ'তে পরিণত হয়ে 'বাঙা' শব্দে পরিণত হয়েছে। মধ্যস্বরাগমের (anaptaxis) নিয়মে স্বরধ্বনি 'ই' যুক্ত হওয়ায় 'রোদ' শব্দটি হয়েছে 'রোইদ'। আর মধ্যম পুরুষের তুচ্ছার্থক রূপের বর্তমান কালের অনুজ্ঞায় 'উঠ্' শব্দের মহাপ্রাণ ধ্বনি 'ঠ' অল্পপ্রাণ ধ্বনি 'ট'তে পরিণত হওয়ায় নতুন শব্দ হয়েছে 'উট্'।

লোকজ ছড়া : ৮	প্রমিত রূপ
গুম্ য' গুম্ য' লিলমনি।	ঘুম যাও ঘুম যাও নীলমণি।
নো গুম যাইলে কিল-কনি ॥	না ঘুমালে কিল-কনুই ॥
আঙ্গো হুক্কা কাঁদে কা?	আমাদের খোকা কাঁদে কেনো?
ওলা মাসের যোলার লাই'।	ওলা মাছের ঝোলার জন্য।
বড্ডা বুইযার কোলের লাই' ॥	বড় বুবুজানের কোলের জন্য ॥

উপরের ছড়ায় কোনো এক বড় বোনের তার ছোট ভাইকে 'লিলমনি' (নীলমণি) সম্বোধন করে ঘুমপাড়ানি গান গাওয়ার চিত্র ফুটে উঠেছে। বোন তার ছোট ভাইকে মারের ভয় দেখিয়ে ঘুমুতে বলছে। শিশু বড় বোনের কোলে ওঠার জন্য কাতর হতে পারে; 'ওলা মাছে'র প্রতিও তার আসক্তি থাকতে পারে। যে মাছ কলসাদি জলপাত্রে অর্থাৎ তোলা জলে বাঁচিয়ে রাখা যায়, সে মাছই ওলা মাছ। ওলা মাছের ঝোলের প্রতি শিশুর আকর্ষণের কথাও বিজ্ঞাপিত হয়েছে ছড়ার চতুর্থ চরণে।

ছড়ার 'গুম' শব্দটি এসেছে 'ঘুম' শব্দ থেকে, যেখানে মহাপ্রাণ ধ্বনি 'ঘ' অল্পপ্রাণ ধ্বনি 'গ'তে পরিণত হয়েছে। আর শব্দটি একই চরণে দু'বার ব্যবহৃত হয়ে অনুপ্রাস সৃষ্টি করেছে। 'নীল' শব্দের 'ন' ধ্বনিটি সমীভবনের (assimilation) সূত্রে 'ল'তে পরিণত হয়ে এবং উচ্চারণে 'ঈ' ধ্বনি (ী), 'ই' ধ্বনিতে (ি) পরিণত হয়ে 'লিল' শব্দে রূপলাভ করেছে। স্বরের গুণ-বৃদ্ধি-সম্প্রসারণের (vowel-gradation) নিয়মে 'না' এর 'আ' ধ্বনি (া) 'ও' ধ্বনিতে (ো) পরিণত হওয়ায় এটি 'নো'তে পরিণত হয়েছে। 'কনুই' শব্দের 'ন' এর 'উ' ধ্বনি (ু) মধ্যস্বরলোপের (syncope) নিয়মে উঠে গিয়ে এবং স্বরধ্বনি 'ই' অপিনিহিতির (apenthesis) নিয়মে 'ন' এর আগে উচ্চাতির হওয়ায় শব্দটি 'কনি' শব্দে রূপলাভ করেছে। আর শব্দটির আভিধানিক অর্থ বাহু ও হস্তের মিলনস্থল হলেও নোয়াখালীর আঞ্চলিক ভাষায় শব্দটি অর্থগত পরিবর্তনের (semantic change) সূত্রে 'কনুই' এর আঘাত অর্থে ব্যবহৃত হয়। এ প্রসঙ্গে রফিকুল ইসলাম লিখেছেন, "এটা স্পষ্ট বোঝা যায় যে, কোন রূপের[১২] অর্থের পরিবর্তনের কারণ হল তার ব্যবহারের পরিবর্তনের ফল।" (রফিকুল, ১৯৯৭:৩০৫) সুতরাং, ব্যবহারের পরিবর্তনের ফলে অর্থের পরিবর্তন ঘটায় 'কনুই' শব্দের 'কনি'তে রূপান্তর এবং এর ভিন্নার্থক ব্যবহার অস্বভাবিক কিছু নয়। 'আঙ্গো' ও 'হুক্কা' শব্দের ভাষাতাত্ত্বিক রূপ ইতঃপূর্বে ২ নম্বর ছড়া বিশ্লেষণে দেখানো হয়েছে। আলোচ্য ছড়ার তৃতীয় চরণের 'কা' কথাটি এসেছে 'কেন' শব্দ থেকে। শব্দটির 'ন' ধ্বনি এবং তার উদ্বৃত্তস্বর 'অ' লোপ পেয়েছে। আর 'ক' এর 'এ' ধ্বনি (ে) স্বর-সংকোচনের (vowel-mutation) নিয়মে 'আ' ধ্বনিতে (া) পরিণত হয়েছে। আর 'মাসের' শব্দে সকারীভবনের (assibilation) সূত্রে 'ছ' 'স'তে পরিণত হয়েছে। 'ঝোলা' শব্দের 'ঝ' যকারীভবনের নিয়মে 'য'তে পরিণত হওয়ায় এবং ষষ্ঠী বিভক্তি 'র' যুক্ত হওয়ায় সম্বন্ধপদ হয়েছে 'যোলার'। 'লাগিয়া' শব্দ থেকে এসেছে 'লাই' শব্দটি এবং শব্দটির যুগল ব্যবহার ছড়াটির শেষ দুই চরণে অন্ত্যানুপ্রাস সৃষ্টি করেছে। আর 'লাগিয়া' শব্দের ব্যঞ্জনধ্বনি 'গ', অর্ধস্বরধ্বনি 'য়' (y) এবং তার উদ্বৃত্তস্বর আ (া) লোপ পেয়ে এবং 'গ' এর উদ্বৃত্তস্বর 'ই' (ি) পূর্ণস্বরধ্বনিতে পরিণত হয়ে 'লাই' শব্দ গঠনে সহায়তা করেছে।[১৩] 'বড়' শব্দের তৎসম রূপ 'বড্ড'। আর 'বড্ড' শব্দের সাথে অন্ত্যস্বরাগমের (apothesis) নিয়মে 'আ' ধ্বনি (া) যুক্ত হওয়ায় নতুন শব্দ হয়েছে 'বড্ডা'। 'বুবুজান' শব্দ থেকে এসেছে 'বুইযা' শব্দটি। এর সাথে ষষ্ঠী বিভক্তি 'র'

যুক্ত হয়ে সম্বন্ধপদ হয়েছে 'বুইযার'। 'বুবুজান' শব্দের দ্বিতীয় 'ব' এবং 'ন' ধ্বনি অন্তর্হতি বা ব্যঞ্জনলোপের সূত্রে লোপ পেয়েছে। আর দ্বিতীয় 'ব' এর উদ্বৃত্তস্বর 'উ' (ু) স্বরসংকোচন বা vowel-mutaiton এর নিয়মে 'ই'তে পরিণত হয়েছে।

লোকজ ছড়া : ৯	প্রমিত রূপ
সান্নি সান্নি হুঁতা কাট।	চাঁদনি চাঁদনি সুতা কাট।
কাইল ব্যানে দতের আঁট।।	কাল সকালে দত্তের হাট।।
দতের আঁড়ে যাইচ্ছা।	দত্তের হাটে যাসনে।
বাঁডা মাস কিনিচ্ছা।।	বাটা মাছ কিনিসনে।।
বাঁডা মাসের ত্যালে।।	বাটা মাছের তেলে।
মোমবাত্তি যলে।।	মোমবাতি জ্বলে।।
কোনান্‌দি কোনান্‌দি যলে?	কোন খান দিয়ে কোন খান দিয়ে জ্বলে?
যিরিয়া গাসের তলে।।	জিরে গাছের তলে।
যিরিয়া গাসের নাম কি?	জিরে গাছের নাম কী?
কাঁডা মাইরা খান নি?	কাঁটাওয়ালা ডাঁটা খান কি?

চাঁদের বুড়ির চরকায় সুতা কাটার প্রসঙ্গ সবার কম-বেশি জানা আছে। মা ছোট শিশুকে চাঁদ দেখিয়ে সে প্রসঙ্গ তুলে ধরলেও পরের দিন যে হাটবার তা তিনি বিস্মৃত হননি। আর নোয়াখালী জেলা শহরে অবস্থিত দত্তের হাটে সামুদ্রিক মাছ বাটা যে প্রচুর পরিমাণে ও সস্তায় পাওয়া যায় এবং স্বল্প-আয়ের মানুষ যে তার খাবার ও আমিষের অভাব এর দ্বারা সহজে পূরণ করতে পারে সে বিষয়টি এখানে প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে। আবার মোমবাতি জ্বলার জন্য তেল আবশ্যক না হলেও বাটা মাছের তেলে মোমবাতি জ্বলা এবং জিরে গাছের তলে আপনা-আপনি মোমবাতি জ্বলার ঘটনা একাধারে অস্বাভাবিক ও অসংলগ্ন। তেমনি 'যিরিয়া গাছে'র নামোল্লেখের পর আবার তার নাম জানতে চাওয়া অর্থহীন। আবার কাকে কেন কাঁটাওয়ালা ডাঁটা খাওয়া-না খাওয়ার কথা জিজ্ঞাসা করা হলো তা বোধগম্য নয়। তবে এর সব কিছুই লোকজ-ছড়ার বৈশিষ্ট্যেরই অংশ।

আলোচ্য ছড়ার 'সান্নি' শব্দটি এসেছে 'চাঁদনি' শব্দ থেকে। 'চাঁদনি' শব্দটি বিশেষণ পদ এবং এর অর্থ জ্যোৎস্নাময়ী। কিন্তু আলোচ্যাংশে 'সান্নি' শব্দটি বিশেষ্য পদ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে এবং 'সান্নি সান্নি' শব্দদ্বৈতের দ্বারা চাঁদকে আহবান করা হয়েছে। আর 'চাঁদনি' শব্দের 'দ' ধ্বনিটি gemination বা যুগ্মীভবনের সূত্রে 'ন'তে পরিণত হয়ে, 'চ' ধ্বনিটি সকারীভবনের (assibilation) নিয়মে 'স'তে পরিণত হয়ে এবং নাসিক্য ধ্বনি 'ন' যুক্ত হওয়ায় নতুন শব্দ হয়েছে 'সান্নি'। আবার একই ছড়ায় কেবল সকারীভবনের নিয়মে 'মাছ' থেকে 'মাস' (mas), 'মাছের' থেকে 'মাসের'

(maser) এবং 'গাছের' (gacher) থেকে 'গাসের' (gaser) শব্দের উদ্ভব ঘটেছে। এছাড়া ছড়াটির প্রথম চরণের 'হুঁতা' শব্দটি এসেছে 'সুতা' শব্দ থেকে। এর 'স' ধ্বনিটি sound-change বা ব্যঞ্জন-পরিবর্তনের সূত্রে 'হ'তে পরিণত হয়েছে এবং 'হ' এর 'উ' ধ্বনি (ু) স্বতোনাসিক্যীভবনের সূত্রে আনুনাসিক স্বরধ্বনিতে পরিণত হয়েছে। দ্বিতীয় চরণে 'কাল' শব্দে মধ্যস্বরাগমের (anaptysix) নিয়মে স্বরধ্বনি 'ই' যুক্ত হওয়ায় তা 'কাইল' শব্দে পরিণত হয়েছে। তৎসম 'বিহান' শব্দের অভিধান-স্বীকৃত পরিবর্তিত রূপ 'বেহান'। আর 'বেহান' শব্দের 'হ' ধ্বনিটি 'হ'কার লোপের সূত্রে এবং তার উদ্বৃত্তস্বর 'আ' (া) যথাবিধি লোপ পেয়েছে। এছাড়া 'ব'-এর 'এ' ধ্বনি (ে) বিবৃত উচ্চারণ ধারণ করে এবং সপ্তমী বিভক্তি 'এ' যুক্ত হয়ে 'ব্যানে' শব্দে পরিণত হয়েছে। 'দতের' শব্দটি দত্ত+এর = দত্তের > দতের—এভাবে গঠিত হয়েছে। এক্ষেত্রে ষষ্ঠী বিভক্তি 'এর' যুক্ত হয়ে সম্বন্ধপদ সৃষ্টির পাশাপাশি ব্যঞ্জনচ্যুতির নিয়মে 'ত্ত' এর একটি 'ত' চ্যুত হয়েছে বা লোপ পেয়েছে। 'হাট' শব্দের 'হ' ধ্বনিটি 'হ'কার লোপের সূত্রে লোপ পেয়ে, তার উদ্বৃত্তস্বর 'আ' অটুট থেকে এবং 'আ' অনুনাসিক স্বরধ্বনিতে পরিণত হয়ে 'আঁট' শব্দে পরিণত হয়েছে। পরের চরণে ঘোষীভবনের (voicing) সূত্রে 'ট' 'ড'তে পরিণত হওয়ায় এবং সপ্তমী বিভক্তি 'এ' (ে) যুক্ত হওয়ায় তা হয়েছে 'আঁডে'। 'যাইচ্ছা' ও কিনিচ্ছা' শব্দদ্বয় এসেছে মধ্যম পুরুষের অনুজ্ঞার তুচ্ছার্থক রূপ যথাক্রমে যাসনে (উচ্চারণ : জাশ্নে) ও কিনিসনে (উচ্চরণ : কিনিশ্নে) থেকে। উভয় ক্ষেত্রেই 'ন' এবং তার উদ্বৃত্তস্বর 'এ' (ে) লোপ পেয়েছে। 'যাইচ্ছা' শব্দে মধ্যস্বরাগমের (anaptyxic) নিয়মে স্বরধ্বনি 'ই' যুক্ত হয়েছে। আর নোয়াখালীর আঞ্চলিক ভাষায় আলোচ্য উভয় শব্দের 'শ' ধ্বনিটি gemination বা যুগ্মীভবনের নিয়মে 'চ্ছ'তে পরিণত হয়েছে। 'শ' এর 'চ্ছ' তে পরিণত হবার অনুরূপ দৃষ্টান্ত : উৎ+শৃঙ্খল = উচ্ছৃঙ্খল, উৎ+শ্বাস= উচ্ছ্বাস ইত্যাদি। 'বাঁডা' ও 'কাঁডা' শব্দে ঘোষীভবনের সূত্রে 'ট' 'ড'তে পরিণত হয়েছে। আর 'কাঁডা' শব্দে তৎসম 'কণ্টক' শব্দের 'ক' এর উদ্বৃত্তস্বর 'অ' vowel-gradation বা স্বরের গুণ-বৃদ্ধি-সম্প্রসারণের নিয়মে 'আ'তে পরিণত হয়েছে। আর নাসিক্য ধ্বনি 'ন' এর পরিবর্তে 'আ' ধ্বনিটি অনুনাসিক স্বরধ্বনিতে (আঁ) পরিণত হয়েছে। 'বাঁডা' শব্দে কেবল স্বতোনাসিক্যীভবনের সূত্রে 'ব' এর 'আ' ধ্বনি অনুনাসিক স্বরধ্বনিতে পরিণত হয়েছে। 'ত্যালে' শব্দে 'ত' এর 'এ' ধ্বনি (ে) বিবৃত উচ্চারণ ধারণ করেছে। আর 'জ্বলে' শব্দের 'ব'ফলা অনুচ্চারিত থেকে এবং 'জ' যকারীভবনের নিয়মে 'য'তে পরিণত হয়ে 'যলে' শব্দে রূপলাভ করেছে।[১৪] 'কোনানদি' কথাটি 'কোন খান দিয়ে' শব্দগুচ্ছের একীভূত রূপ। এক্ষেত্রে 'য়' এবং এর উদ্বৃত্তস্বর 'এ' (ে) লোপ পেয়েছে। তবে 'খ' এর উদ্বৃত্তস্বর 'আ' পূর্বস্বরের বৃদ্ধি ঘটিয়েছে। যেমন : 'ন'-এর 'অ' ধ্বনি 'আ' ধ্বনিতে (া) পরিণত হয়েছে। আর শেষ চরণের 'মাইরা' শব্দটি রূপমূল পুনর্গঠন প্রক্রিয়ায় 'ডাঁটা' শব্দ থেকে এসেছে।

লোকজ ছড়া : ১০	প্রমিত রূপ
যড়ি আইয়েরে নুরুল্লা ।	ঝড় আসেরে নুরুল্লা ।
খাদের বিত্‌রে তুরুল্লা ।	খাদের ভিতরে তুরকুলা ।
খ্যাঁতে খ্যাঁতে বদিল্লা ।	খেতে খেতে বদলা ।

আলোচ্যাংশে ঝড়ের আগমন, ঝড়ের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য তুরকুলা পোকাদের খাদ বা গর্তে প্রবেশ করা এবং ঝড়কে উপেক্ষা করে বদলাদের মাঠে কাজ করার মধ্যে ফুটে উঠেছে এক অসাধারণ চিত্রকল্প। ঝড়ের পূর্বাভাস পেয়ে গর্তে বসবাসকারী পোকা তুরকুলারা খাদে বা গর্তে প্রবেশ করলেও স্বল্প আয়ের বদলার কিংবা কৃষিজীবী নুরুল্লাদের মতো মানুষের ঘরে ফিরে যাবার সে সুযোগ নেই। কারণ, রোদ-বৃষ্টি মাথায় নিয়ে তাদের জীবিকান্বেষণ করতে হয়।

আলোচ্যাংশে 'যড়ি' শব্দটি এসেছে 'ঝড়' শব্দ থেকে। 'ঝড়' শব্দের মহাপ্রাণ ধ্বনি (aspirated-sound) 'ঝ' য'কারীভবনের সূত্রে 'য'তে পরিণত হয়ে এবং অন্ত্যস্বরাগমের (apothesis) নিয়মে 'ড়' এর সাথে স্বরধ্বনি 'ই' যুক্ত হয়ে 'যড়ি' শব্দে পরিণত হয়েছে। 'আইয়েরে' শব্দটি এসেছে 'আসেরে' থেকে। এক্ষেত্রে 'আসে' এর সাথে ক্রিয়া বিভক্তি 'রে' যুক্ত হওয়ায় তা হয়েছে 'আসেরে'। কাউকে কোনো বিষয়ে অবহিত করা বা সতর্ক করার জন্য শব্দটি ব্যবহার করা হয়। যেমন : 'বৃষ্টি আসেরে', 'গাড়ি আসেরে', 'চোর আসেরে' ইত্যাদি। আর 'আসেরে' শব্দের 'আ' ধ্বনির পর মধ্যস্বরাগমের (anaptyxis) নিয়মে স্বরধ্বনি 'ই' যুক্ত হয়ে, 'স' ধ্বনিটি লোপ পেলেও তার উদ্বৃত্তস্বর 'অ' এবং 'এ' ধ্বনি (ে) অটুট থেকে এবং স্বরধ্বনি 'অ' অর্ধস্বরধ্বনি 'য়'তে পরিণত হয়ে 'আইয়েরে' শব্দে পরিণত হয়েছে। 'ভিতরে' শব্দ থেকে এসছে 'বিত্‌রে' শব্দটি। এক্ষেত্রে মহাপ্রাণ ধ্বনি 'ভ' মহাপ্রাণহীনতার (nonaspiration) সূত্রে 'ব'তে পরিণত হয়েছে এবং দ্বিমাত্রিকতার (dimetrism) নিয়মে 'ত' এর সাথে একটি হসন্ত (্) বসেছে। 'তুরকুলা' শব্দের 'ক' gemination বা যুগ্মীভবনের নিয়মে 'ল'তে পরিণত হয়েছে এবং তার উদ্বৃত্তস্বর 'উ' (ু) পূর্ববর্তী বর্ণ 'র'-এর সাথে মিশে হয়েছে 'তুরুল্লা'। 'খ্যাঁতে খ্যাঁতে' শব্দদ্বৈতের প্রকৃত রূপ 'খেতে খেতে' (ক্ষেত্রে বা ফসলি জমিতে)। এক্ষেত্রে 'খ' এর 'এ' ধ্বনি (ে) বিবৃত উচ্চারণে 'অ্যা'তে পরিণত হয়েছে এবং স্বতোনাসিক্যীভবনের সূত্রে তা অনুনাসিক স্বরধ্বনিতে পরিণত হয়েছে (খ্যাঁ)। অন্যদিকে 'বদলা' শব্দে মধ্যস্বরাগমের (anaptyxis) নিয়মে 'দ'-এর সাথে স্বরধ্বনি 'ই' (ি) যুক্ত হয়ে এবং 'ল' ধ্বনিটি ব্যঞ্জনদ্বিত্বের (long-consonant) নিয়মে দ্বিত্ব হয়ে 'বদিল্লা' শব্দটি গঠন করেছে।

লোকজ ছড়া : ১১	প্রমিত রূপ
ব্যাইন ব্যাইন কোইতুরি ।	বেয়ান বেয়ান কইতরি ।
বাউয়া ব্যাঙের আঁতুড়ি ॥	বাওয়া ব্যাঙের আঁতড়ি ॥

ব্যাইন আইসে রাইত করি'। বেয়ান এসেছে রাত করে।
সোতি দরে কাইত করি' ॥ ছাতি ধরে কাত করে ॥

ছড়াটিতে আত্মীয়ের বাড়িতে বেয়ানের আগমন এবং বেয়ানের উপমা হিসাবে 'কোইতুরি' (স্ত্রী কবুতর) ও 'আঁতুড়ি' (আঁতড়ি) শব্দদ্বয় ব্যবহার করা হয়েছে। পাখিদের মধ্যে কবুতর খুব সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন পাখি। এর সাথে মানুষের আবার খুব সহজে সখ্য গড়ে ওঠে। তাই বেয়ানের উপমা হিসেবে স্ত্রী কবুতর ব্যবহার করা হয়েছে। আবার বেয়ানের সাথে সম্পর্কের নিবিড়তা বুঝাতে, অর্থাৎ বেয়ানের প্রতি নাড়ির টান বুঝাতে 'আঁতুড়ি' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। আর কেবল মজা করার জন্য বাওয়া ব্যাঙের আঁতড়ির সাথে বেয়ানের তুলনা করা হয়েছে। বেয়ানকে ঘরে আনতে ছাতা নিয়ে একটু আগ বাড়িয়ে যাওয়ার রেওয়াজ শুধু নোয়াখালীতে নয়, বাংলার গ্রামীণ সমাজে কম-বেশি লক্ষ করা যায়। বেয়ানের রাত করে আসার বিষয়টি অবান্তর; হয়তো তিনি একটু বিলম্বে এসেছেন।

ছড়াটিতে 'বেয়ান' শব্দের 'ব' এর 'এ' ধ্বনি (ে) বিবৃত উচ্চারণ ধারণ করে, অন্তঃস্থ 'য়' অন্তর্হতি বা ব্যঞ্জনলোপের সূত্রে লোপ পেয়ে এবং তার উদ্বৃত্তস্বর 'আ' (া) vowel-gradation বা স্বরের গুণ-বৃদ্ধি-সম্প্রসারণের নিয়মে 'ই'তে পরিণত হয়ে 'ব্যাইন' শব্দে রূপান্তরিত হয়েছে। 'কবুতর' শব্দের অভিধান-স্বীকৃত আরেক রূপ 'কইতর'। আর 'কইতর' শব্দে মধ্যস্বরাগমের (anaptyxis) নিয়মে 'ত' এর সাথে 'উ' ধ্বনি যুক্ত হয়ে এবং স্ত্রীবাচক প্রত্যয় 'ই' যুক্ত হয়ে নতুন স্ত্রীবাচক শব্দ হয়েছে 'কইতুরি'। আর আদ্য 'অ' (ক এর সাথে যুক্ত অ) এর পর স্বরধ্বনি ই' থাকায় এর উচ্চারণ হয়েছে 'কোইতুরি'। 'বাউয়া' শব্দটি এসেছে 'বাওয়া' শব্দ থেকে। 'বাওয়া' শব্দের অর্থ ভ্রূণশূন্য বা শাবক উৎপাদনে অসমর্থ। এক্ষেত্রে 'বাওয়া' শব্দের 'ও' ধ্বনিটি সর-সংকোচন বা vowel-mutation এর নিয়মে 'উ'তে পরিণত হয়েছে। 'আঁতুড়ি' শব্দটি এসেছে 'আঁতড়ি' থেকে, যার অর্থ নাড়িভুঁড়ি। এক্ষেত্রে মধ্যস্বরাগমের (anaptyxis) নিয়মে 'ত' এর সাথে 'উ' ধ্বনি যুক্ত হয়ে হয়েছে 'আঁতুড়ি'। 'আসিয়াছে' ক্রিয়াপদের 'স' লোপ পেলেও এর উদ্বৃত্তস্বর 'ই' বজায় থেকে, অন্তস্থ্য 'য়' এবং তার উদ্বৃত্তস্বর 'আ' (া) লোপ পেয়ে এবং 'ছ' ধ্বনিটি সকারীভবনের (assibilation) সূত্রে 'স'তে পরিণত হয়ে 'আইসে' ক্রিয়াপদ গঠন করেছে। 'রাত' শব্দে কেবল মধ্যস্বরাগমের (anaptyxis) নিয়মে স্বরধ্বনি 'ই' যুক্ত হওয়ায় তা হয়েছে 'রাইত'। করি' শব্দদ্বয় অসমাপিকা ক্রিয়া 'করিয়া' এর অন্তঃস্থ 'য়' এবং তার উদ্বৃত্তস্বর 'আ' (া) লোপে গঠিত হয়েছে। 'সোতি' শব্দটি এসেছে 'ছাতি' থেকে। এক্ষেত্রে 'ছ' ধ্বনিটি সকারীভবনের (assibilation) নিয়মে 'স'তে পরিণত হয়েছে এবং 'ছ' এর 'আ' ধ্বনি (া) vowel-gradation এর নিয়মে 'ও' ধ্বনিতে (ো) পরিণত হয়েছে। 'ধরে' শব্দের মহাপ্রাণ ধ্বনি 'ধ' অল্পপ্রাণ ধ্বনি 'দ'তে পরিণত হওয়ায় তা 'দরে' শব্দে পরিণত হয়েছে। আর 'কাত' শব্দে কেবল মধ্যস্বরাগমের (anaptyxis) নিয়মে স্বরধ্বনি 'ই' যুক্ত হওয়ায় তা হয়েছে 'কাইত'।

লোকজ ছড়া : ১২	প্রমিত রূপ
বেইল্লা মাতা টাকটুক ।	বেল মাথা টাকটুক ।
বারিশ কালে আইগ্‌দে শুক ॥	বর্ষা কালে হাগতে সুখ ॥
বেইল্লা মাতা সাইরানা ।	বেল মাথা চার আনা ।
সাবি দিলে গুরে না ॥	চাবি দিলে ঘোরে না ॥
সাবি নষ্ট ।	চাবি নষ্ট ।
বেইল্লা মাতার কষ্ট ॥	বেল মাথার কষ্ট ॥

বেল সদৃশ হওয়ায় ন্যাড়া মাথাকে উপমায় 'বেইল্লা' মাথা বলা যেতে পারে। আবার ন্যাড়া মাথার আরেক নাম 'টাকমাথা'। কেবল অনুপ্রাস সৃষ্টির লক্ষ্যে শব্দদ্বৈতের নিয়মে 'টাকটুক' শব্দটি গঠন ও ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু ন্যাড়া মাথা কিনতে পাওয়া যায় এবং তার মূল্য কেবল চার আনা, সে কথা একেবারে অবাস্তব ও অবাস্তর। আবার, চাবি দিয়ে ন্যাড়া মাথা ঘুরানো যায়, আর নষ্ট চাবি দিয়ে ন্যাড়া মাথা ঘুরানো যায় না এবং না ঘুরতে পারলে ন্যাড়া মাথা কষ্ট পায়—এসব শিশুর কল্পনাতে সম্ভব হলেও বাস্তবে নয়। তবে এ অসংলগ্নতা ও অবাস্তবতা ছড়ার বৈশিষ্ট্যেরই একটি দিক।

বেল বাংলাদেশের একটি ফল। 'বেল' শব্দের সাথে 'ইয়া' প্রত্যয় যুক্ত হয়ে হয়েছে 'বেলিয়া'। সেখান থেকে 'ল' এর 'ই' ধ্বনি (ি) অপিনিহিতির (apenthesis) সূত্রে আগে উচ্চারিত হয়ে, অর্ধস্বর 'য়' (y) লোপ পেয়ে এবং gemination বা যুগ্মীভবনের নিয়মে 'ল' দ্বিত্ব হয়ে নতুন শব্দ হয়েছে 'বেইল্লা'। শব্দটির ব্যুৎপত্তি এরূপ: বেল+ইয়া> বেলিয়া> বেইল্লা। এরপর 'মাথা' (মস্তক) শব্দের মহাপ্রাণ ধ্বনি 'থ' অল্পপ্রাণ ধ্বনি 'ত'তে পরিণত হওয়ায় নতুন শব্দ হয়েছে 'মাতা'। 'টাকটুক' শব্দদ্বৈতের ব্যবহার হয়েছে কেবল ধ্বনিব্যঞ্জনা সৃষ্টির লক্ষ্যে। 'বর্ষা' শব্দ থেকে 'বারিশ' শব্দের রূপান্তর ঘটেছে এভাবে: বর্ষা > বরিষা > বারিশা > বারিশ। 'বর্ষা' শব্দে মধ্যস্বরাগমের (anaptysix) নিয়মে স্বরধ্বনি 'ই' যুক্ত হয়ে হয়েছে 'বরিষা'।[১৫] এরপর আদিস্বরাগমের (prothesis) নিয়মে 'ব' এর সাথে স্বরধ্বনি 'আ' (া) যুক্ত হয়ে তা হয়েছে 'বারিষা'। সবশেষে অন্ত্যস্বরলোপের (apocope) নিয়মে 'বারিষা' শব্দের শেষের 'আ' ধ্বনি (া) লোপ পেয়ে এবং উচ্চারণ-নির্ভর নোয়াখালীর আঞ্চলিক ভাষায় 'ষ' ধ্বনিটি তালব্যীভবনের (palatalization) নিয়মে 'শ'তে পরিণত হয়ে 'বারিশ' শব্দে রূপান্তরিত হয়েছে। অসমাপিকা ক্রিয়া 'হাগতে'—এর 'হ' ধ্বনিটি 'হ'কার লোপের সূত্রে লোপ পেয়ে এবং তার উদ্বৃত্তস্বর 'আ' (া) অটুট থেকে, 'ত' ধ্বনিটি ঘোষীভবনের (voicing) সূত্রে 'দ'তে পরিণত হয়ে এবং মধ্যস্বরাগমের (anaptyxis) নিয়মে স্বরধ্বনি 'ই' যুক্ত হয়ে 'আইগদে' শব্দে পরিণত হয়েছে। 'সুখ' শব্দের 'স' ধ্বনিটি তালব্যীভবনের (palatalization) সূত্রে 'শ'তে এবং মহাপ্রণ ধ্বনি 'খ'

মহাপ্রাণহীনতার সূত্রে (nonaspiration) 'ক'তে পরিণত হয়ে 'শুক' শব্দে পরিণত হয়েছে। চার আনা– এ শব্দ দুটিকে সন্ধিবদ্ধ করলে নতুন শব্দ হয় 'চারানা'। শব্দটির 'চ' ধ্বনিটি সকারীভবনের (assibilation) নিয়মে 'স'তে পরিণত হওয়ায় এবং 'স' এর পর মধ্যস্বরাগমের (anaptyxis) নিয়মে স্বরধ্বনি 'ই' যুক্ত হওয়ায় এর নতুন রূপ হয়েছে 'সাইরানা'। চাবি (chabi) শব্দের 'চ' সকারীভবনের (assibilation) সূত্রে 'স'তে পরিণত হওয়ায় তা হয়েছে সাবি (sabi)। আর 'ঘুরে' শব্দের মহাপ্রাণ ধ্বনি 'ঘ' অল্পপ্রাণ ধ্বনি 'গ'তে পরিণত হওয়ায় নতুন শব্দ হয়েছে 'গুরে'।

লোকজ ছড়া: ১৩	প্রমিত রূপ
মাগো মা বড্ডা বুইযার যামাই আইসে।	মাগো মা বড় বুবুজানের জামাই এসেছে।
কইরে যাদু কই?	কইরে জাদু কই?
হাঁফার তলে হলাই রইসে।	সাঁকোর তলে পালিয়ে রয়েছে।
সাঁইয়া হিডা লই' ॥	ছাঁকা পিঠা নিয়ে ॥
সাঁইয়া হিডা খাইতান ন'।	ছাঁকা পিঠা খাব না।
মাইয়া বিয়া দিতান ন' ॥	মেয়ের বিয়ে দেব না ॥
মাইয়ার অইসে আমশা।	মেয়ের হয়েছে আমাশয়।
গোল গোল বাতাশা ॥	গোল গোল বাতাসা ॥

আলোচ্যাংশে কোনো লোকের শীতের পিঠা, বিশেষ করে নোয়াখালী আঞ্চলের সবচেয়ে প্রিয় শীতকালীন পিঠা নিয়ে শ্বশুর-বাড়ি যাবার কথা বলা হয়েছে। আর শীতকালে খাল-বিল শুকনো থাকে এবং অপরিহার্যতা না থাকায় খালের উপরের সাঁকোও অনেক সময় চলাচলের অনুপযোগী থাকে। তাই মানুষের পক্ষে সাঁকোর উপর দিয়ে না গিয়ে এর নিচ দিয়ে চলাচল করা অস্বাভাবিক নয়। শ্বশুর-বাড়িগামী লোকের শ্যালক তার খাল পারাপারের এ দৃশ্য দেখে ফেলে এবং তার কাছে এটি সাঁকোর নিচে লুকিয়ে থাকার মতোই প্রতিভাত হয়। ছোট শিশু হয়তো নিছক আনন্দ পাওয়ার জন্য মা'র কাছে এ তথ্য দিয়েছে। কিন্তু মার পক্ষে তা বিশ্বাস করা, পিঠা না খাওয়ার সংকল্প করা, কেবল আমাশয় হওয়ার কারণে মেয়েকে বিয়ে না দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া এবং পুরনো জামাই হওয়া সত্ত্বেও মেয়ে বিয়ে দেওয়া না-দেওয়ার প্রশ্ন তোলা অসঙ্গত ব্যাপার। তবে এসব লোকজ ছড়ার বৈশিষ্ট্যেরই অংশ।

আলোচ্য ছড়ার 'বড্ডা বুইযা' শব্দদ্বয় এসেছে 'বড় বুবুজান' থেকে। ইতঃপূর্বে লোকজ ছড়া: ৮-এ এর বিশ্লেষণ করা হয়েছে। প্রথম চরণের 'আইসে' শব্দটি এসেছে 'আসিয়াছে' শব্দ থেকে। এর দন্ত্যধ্বনি 'স' এবং অন্তঃস্থ ধ্বনি 'য়' লোপ পেয়েছে; 'স' এর উদ্বৃত্তস্বর 'ই' (ি) অটুট রয়েছে এবং 'ছ' ধ্বনিটি সকারীভবনের

(assibilation) সূত্রে 'স'তে পরিণত হয়েছে। 'হাঁফার' শব্দটি এসেছে 'সাঁকোর' (সাঁকো+র) শব্দ থেকে। sound-change বা ব্যঞ্জন-পরিবর্তনের নিয়মে 'সাঁকোর' 'স' 'হ'তে, 'ক' 'ফ'তে এবং 'ক' এর 'ও' ধ্বনি (ো) স্বর-সংকোচনের (vowel-mutation) নিয়মে 'আ' ধ্বনিতে (া) পরিণত হয়েছে। আর কণ্ঠ্যধ্বনি 'ক' ওষ্ঠ্যধ্বনি 'ফ'তে পরিণত হবার ক্ষেত্রে একাধারে ওষ্ঠীভবন (labialization), ঘোষীভবন (voicing) এবং ধ্বনির মহাপ্রাণিত (aspirated) হবার লক্ষণ বা বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায়। 'হলাই রইসে' কথাটি এসেছে সাধু ভাষার যৌগিক ক্রিয়া 'পলাইয়া রহিয়াছে' থেকে। এখানে 'প' ধ্বনিটি sound-change বা ব্যঞ্জন-পরিবর্তনের নিয়মে 'হ'তে পরিণত হয়ে এবং semi-vowel 'য়' ও তার উদ্বৃত্তস্বর 'আ' (া) লোপ পেয়ে অসমাপিকা ক্রিয়া হয়েছে 'হলাই'। আর 'রহিয়াছে' শব্দের 'হ'কার এবং semi-vowel বা অর্ধস্বরধ্বনি 'য়' এবং 'আ' ধ্বনি (য়া) লোপ পেয়ে এবং সকারীভবনের (assibilation) সূত্রে 'ছ' 'স'তে পরিণত হয়ে 'রইসে' (roise) শব্দে পরিণত হয়েছে। এক্ষেত্রে 'হ' এর উদ্বৃত্তস্বর 'ই' অটুট রয়েছে। 'সাঁইয়া হিডার' 'সাঁইয়া' শব্দটির ব্যুৎপত্তি এ রকম: ছাঁক + ইয়া = ছাঁকিয়া > ছাঁইয়া > সাঁইয়া। অর্থাৎ, ছাঁক বা জালির সাহায্যে ভাপ দিয়ে যে পিঠা তৈরি করা হয় তা-ই 'সাঁইয়া হিডা'। এক্ষেত্রে 'ছাঁক' এর 'ছ' ধ্বনিটি সকারীভবনের (assibilation) সূত্রে 'স'তে পরিণত হয়েছে। আর 'পিঠা' শব্দের 'প' ধ্বনিটি ব্যঞ্জন-পরিবর্তনের (sound-change) নিয়মে 'হ'তে এবং মহাপ্রাণ অঘোষ ধ্বনি 'ঠ' একাধারে মহাপ্রাণহীনতা (nonaspiration) ও ঘোষতা (voicing) প্রাপ্ত হয়ে 'ড'তে পরিণত হয়েছে। 'লইয়া'-এ অসমাপিকতা ক্রিয়ার অন্তঃস্থ 'য়' এবং তার উদ্বৃত্তস্বর 'আ' (য়া) লোপ পেয়ে হয়েছে 'লই'। 'খাইতান ন' ও 'দিতান ন' এ নেতিবাচক যৌগিক ক্রিয়া এসেছে যথাক্রমে 'খাতাইম না' ও 'দিতাম না' থেকে। এক্ষেত্রে 'ন' এর 'আ' ধ্বনি (া) স্বরসংকোচনের (vowel-mutation) নিয়মে 'অ' ধ্বনিতে পরিণত হয়েছে এবং পূর্ববর্তী 'ম' ধ্বনি সমীভবন বা assimilation এর নিয়মে 'ন'তে পরিণত হয়েছে।

লোকজ ছড়া : ১৪	প্রমিত রূপ
মাগো মা মালা দ' খেলাইতাম।	মাগো মা মালা দাও খেলা করতাম।
বাঁশি দ' বাযাইতাম ॥	বাঁশি দাও বাজাতাম ॥
বাঁশির বিত্‌রে কোম্‌বার দানা।	বাঁশির ভিতরে কুমড়ার দানা।
টিব দিলে কয় ডাক্তরখানা ॥	টিপ দিলে বলে ডাক্তারখানা ॥
ডাক্তরখানা বৈরাগি।	ডাক্তারখানা বৈরাগী।
আঁরে এক্‌কান যিরাফি ॥	আমাকে একখান জিলাপি ॥
যিরাফি খাইতে মিষ্টি লাগে।	জিলাপি খেতে মিষ্টি লাগে।
হইশা দিতে কষ্ট লাগে ॥	পয়সা দিতে কষ্ট লাগে ॥

গ্রামের দরিদ্র পরিবারের শিশুরা কোনো মূল্যবান খেলনা নয়, ঠুনকো জিনিস দিয়েই পরম আনন্দে খেলা করে যায়। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পথের পাঁচালী' উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র অপুর 'আম-আঁটির ভেঁপু'র মতো নারিকেলের মালা, আমের আঁটি কিংবা পাতার বাঁশির মতো খেলনা দিয়ে বাংলাদেশের অন্যান্য জেলার গ্রামাঞ্চলের শিশুদের মতো নোয়াখালী জেলার গ্রামাঞ্চলের শিশুরা পরম আনন্দে খেলা করে।

ছড়ার প্রথম চরণের 'মালা' শব্দটি গলার মালা বা হার অর্থে নয়, নারিকেলের বাটির খোলা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, যার তৎসম রূপ 'মলুক'। অনুজ্ঞায় মধ্যম পুরুষের ক্রিয়ার সাধারণ রূপ 'দাও' এর 'দ' এর 'আ' ধ্বনি (া) এবং 'ও' ধ্বনি সম্প্রকর্ষ বা স্বরলোপের সূত্রে লোপ পেয়ে হয়েছে দ'। 'বাযাইতাম' ও 'যিরাফি' শব্দে যকারীভবনের সূত্রে 'জ' 'য'তে পরিণত হয়েছে। আর খেলাইতাম (খেলা করার জন্য) ও 'বাযাইতাম' (বাজানোর জন্য) শব্দে মধ্যস্বরাগমের (anaptyxis) নিয়মে স্বরধ্বনি 'ই' যুক্ত হয়েছে। এরপর 'ভিতরে' শব্দের মহাপ্রাণ ধ্বনি 'ভ' মহাপ্রাণহীনতার (nonaspiration) নিয়মে অল্পপ্রাণ ধ্বনি 'ব'তে পরিণত হয়ে এবং দ্বিমাত্রিকতার (dimetrism) নিয়মে 'ত' ধ্বনির হলন্ত উচ্চারণ হওয়ায় তা হয়েছে 'বিত্‌রে'। আর 'কুমড়ার' শব্দের 'ক' এর 'উ' ধ্বনি (ু) vowel-gradation বা স্বরের গুণ-বৃদ্ধি-সম্প্রসারণের নিয়মে 'ও' ধ্বনিতে (ো) পরিণত হয়ে এবং 'ড়' sound-change বা ব্যঞ্জন-পরিবর্তনের সূত্রে 'ব'তে পরিণত হয়ে হয়েছে 'কোমবার'। এরপর 'টিপ' শব্দের 'প' ধ্বনিটি ঘোষীভবনের (voicing) সূত্রে 'ব'তে পরিণত হয়ে 'টিব' শব্দে এবং 'ডাক্তার' শব্দের 'ক্ত' এর 'আ' ধ্বনি (া) মধ্যস্বরলোপের (syncope) নিয়মে লোপ পেয়ে হয়েছে 'ডাক্তর'। 'একখান' শব্দের 'খ' ধ্বনি সমীভবনের (assimilation) সূত্রে 'ক' ধ্বনিতে পরিণত হওয়ায় তা হয়েছ 'এক্‌কান'। 'যিলাপি' শব্দের 'ল' ধ্বনি sound-change বা ব্যঞ্জন-পরিবর্তনের সূত্রে 'র'তে এবং অল্পপ্রাণ ধ্বনি 'প' aspitration বা মহাপ্রাণতার সূত্রে 'ফ'তে পরিণত হয়ে এবং যকারীভবনের সূত্রে 'জ' 'য'তে পরিণত হয়ে 'যিরাফি' শব্দে পরিণত হয়েছে। আর 'পয়সা' শব্দের 'প' ধ্বনি 'হ' ধ্বনিতে পরিণত হয়ে (sound-change এর নিয়মে) অর্ধস্বর (semi-vowel) 'য়' (y) অপর অর্ধস্বর 'ই'তে (*j*) পরিণত হয়ে এবং দন্ত্য 'স' তালব্যীভবনের (palatalization) সূত্রে 'শ'তে পরিণত হয়ে হয়েছে 'হইশা'।

লোকজ ছড়া: ১৫	প্রমিত রূপ
রোইদ অয় যড়ি অয়।	রোদ হয় ঝড় হয়।
বাঁড় হিয়ালের বিয়া অয় ॥	বাঁড় শিয়ালের বিয়ে হয় ॥
হিয়ালে কইসে বিয়ালে যাইতো।	শিয়ালে বলেছে বিকালে যেতে।
গরম গরম শিন্নি খাইতো ॥	গরম গরম শিরনি খেতে ॥

আয়রে আয় হোলাহাইন। আয়রে আয় ছেলের দল।
শিন্নি খাইতে বরগ আন ॥ শিরনি খেতে বরক আন ॥

শিয়ালের আনুষ্ঠানিক বিয়ের বিষয় কোন মানব-সন্তানের জানা আছে কিনা সন্দেহ। আর রোদ-বৃষ্টির যুগল মুহূর্ত শিয়ালের বিয়ের শুভলগ্ন এটাই বা কী করে জানা গেলো। আবার শিয়ালের বিয়েতে কখনো কোনো মানব-শিশু দাওয়াত পেয়েছে এবং শিয়ালের বিয়েতে গরম শিরনি খাওয়ানো হয় একথা কেউ কোনো দিন শোনেনি। আর গ্রামীণ ভোজানুষ্ঠানে বরক বা কলাপাতায় শিরনি বিতরণ করা হয়। কিন্তু এসব অসঙ্গত কথা লোকজ ছড়ার জন্য মোটেও হানিকর নয়; বরং তা ছড়ার সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করে। আর রোদ-বৃষ্টির যে যুগল মুহূর্ত কল্পনা করা হয়েছে তা এক অসাধারণ চিত্রকল্পের দৃষ্টান্ত।

আলোচ্যাংশে 'রোদ' শব্দে মধ্যস্বরাগমের (anaptyxis) নিয়মে স্বরধ্বনি 'ই' যুক্ত হওয়ায় নতুন শব্দ হয়েছে 'রোইদ'। 'হয়' শব্দের 'হ' কার লোপ পেয়ে এবং তার উদ্বৃত্তস্বর 'অ' অটুট থেকে হয়েছে 'অয়'। 'ঝড়' শব্দের 'ঝ' ধ্বনিটি যকারীভবনের সূত্রে 'য'তে পরিণত হয়ে এবং অন্ত্যস্বরাগমের নিয়মে 'ড়' এর সাথে স্বরধ্বনি 'ই' যুক্ত হয়ে হয়েছে 'যড়ি'। দ্বিতীয় চরণে 'বাঁড় হিয়ালের' বলতে 'পুরুষ শিয়ালের' বুঝানো হয়েছে। এখানে বাঁড় মানে বাঁড়া বা পুরুষাঙ্গ বিশিষ্ট। আর 'শিয়াল' শব্দের 'শ' ধ্বনি sound-change বা ব্যঞ্জন-পরিবর্তনের নিয়মে 'হ'তে পরিণত হয়ে এবং ষষ্ঠী বিভক্তি 'এর' যুক্ত হয়ে হয়েছে 'হিয়ালের'। আবার, 'শ' 'হ'তে পরিণত হবার পাশাপাশি সপ্তমী বিভক্তি 'এ' যুক্ত হয়ে হয়েছে 'হিয়ালে'। 'কইসে' শব্দটি এসেছে সাধু ভাষার ক্রিয়াপদ 'কহিয়াছে' থেকে। এক্ষেত্রে 'হ'কার লোপের সূত্রে 'হ', অর্ধস্বর 'য়' (y) এবং তার উদ্বৃত্তস্বর আ (া) লোপ পেয়ে, 'ছ' ধ্বনিটি সকারীভবনের (assibilation) সূত্রে 'স'তে পরিণত হয়ে 'কইসে' শব্দে পরিণত হয়েছে। অবশ্য এক্ষত্রে 'হ' এর উদ্বৃত্তস্বর 'ই' (ি) বজায় রয়েছে। 'বিকালে' শব্দের 'ক' ধ্বনিটি অন্তর্হতি বা ব্যঞ্জনলোপের সূত্রে লোপ পেয়ে এবং তার উদ্বৃত্তস্বর 'আ' (শব্দমধ্যস্থ হওয়ায়-'য়া') অটুট থেকে হয়েছে 'রিয়ালে'। 'যাইতে' ও 'খাইতে' অসমাপিকা ক্রিয়ার 'ত' এর 'এ' ধ্বনি (ে) vowel-gradation বা স্বরের গুণ-বৃদ্ধি-সম্প্রসারণের নিয়মে 'ও' ধ্বনিতে (ো) পরিণত হওয়ায় শব্দদ্বয় যথাক্রমে 'যাইতো' ও 'খাইতো' শব্দে রূপান্তরিত হয়েছে। 'শিন্নি' শব্দটি এসেছে ফারসি 'শিরনি' শব্দ থেকে। এক্ষেত্রে 'র' ধ্বনিটি 'র'কার লোপের সূত্রে লোপ পাওয়ায় পরবর্তী ব্যঞ্জনধ্বনি 'ন' দ্বিত্ব হয়েছে। 'পোলাপান' শব্দের আভিধানিক অর্থ ছেলেপিলে। আর শব্দটির প্রথম 'প' ধ্বনিটি sound-change বা ব্যঞ্জন-পরিবর্তনের নিয়মে 'হ'তে পরিণত হয়ে এবং মধ্যস্বরাগমের (anaptyxis) নিয়মে স্বরধ্বনি 'ই' যুক্ত হওয়ায় শব্দটি 'হোলাহাইন' শব্দে পরিণত হয়েছে। আর 'বরগ' শব্দটি এসেছে 'বরক' শব্দ থেকে, যার অর্থ কলাপাতা। আগেকার দিনে হাটুরেরা স্বল্প-পরিমাণের দ্রব্যাদি কলাপাতায় মুড়িয়ে

বিক্রি করতেন বলে কথ্য বাংলায় শব্দের অর্থগত পরিবর্তনের সূত্রে (sementic change) কলাপাতা অর্থে 'বরক' শব্দটি ব্যবহৃত হয়। আর নোয়াখালীর আঞ্চলিক ভাষায় ঘোষীভবনের (voicing) সূত্রে 'ক' ধ্বনিটি 'গ' ধ্বনিতে পরিণত হওয়ায় 'বরক' হয়েছে 'বরগ'।

লোকজ ছড়া: ১৬	প্রমিত রূপ
শরে অ, শরে আ বগার ঠ্যাং।	স্বরে অ স্বরে আ বকের ঠ্যাং।
মাশ্‌টর বাবু সুটি দেন ॥	মাস্টার বাবু ছুটি দিন ॥
এই ইস্কুলে হোইটটান্ ন'।	এই স্কুলে পড়তাম না।
ব্যাতের বাড়ি খাতাইন্ ন' ॥	বেতের বাড়ি খেতাম না ॥

ছড়াটিতে বিদ্যালয়ে শিক্ষকের শাসন এবং এর নেতিবাচক প্রভাব প্রকাশ পেয়েছে। বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় নোয়াখালী অঞ্চলে হয়তো শাসনের মাত্রা একটু বেশি। তাই বেতের মারের ভয়ে শিশুর বিদ্যালয়ে না যাওয়ার প্রতিজ্ঞা প্রকাশ পেয়েছে এবং এক একটি বর্ণকে তার কাছে এক একটি বকের ঠ্যাং সদৃশ প্রতিভাত হয়েছে। এ অবস্থায় ছুটিই তার একমাত্র কাম্য।

স্বর, স্বরধ্বনি, স্বরবর্ণ প্রভৃতি শব্দের বানানে দন্ত্য 'স' 'ব'ফলা (স্ব) ব্যবহৃত হলেও আলোচ্যাংশে উচ্চারণ-নির্ভরতার কারণে তালব্য 'শ' দেখানো হয়েছে। অবশ্য এটাও বলা যেতে পারে যে, দন্ত্য 'স' তালব্যীভবনের সূত্রে তালব্য 'শ'তে পরিণত হয়ে এবং শব্দের আদিতে 'ব' ফলার উচ্চারণ না হওয়ার কারণে তা উঠে গিয়ে 'স্বরে'-এর স্থলে হয়েছে 'শরে'। 'বক' শব্দের অভিধান-স্বীকৃত আরেক রূপ 'বগ'। এর সাথে অন্ত্যস্বরাগমের (apothesis) নিয়মে স্বরধ্বনি 'আ' (া) যুক্ত হওয়ায় কথ্য বাংলায় তার রূপ হয়েছে 'বগা'। তার সাথে ষষ্ঠী বিভক্তি 'র' যুক্ত হওয়ায় সম্বন্ধপদ হয়েছে 'বগার'। 'ঠ্যাঙ' শব্দটি 'পা' শব্দের অভিধানস্বীকৃত প্রতিশব্দ। মাস্টার (master) শব্দের 'স্টা' এর 'আ' ধ্বনি (া) মধ্যস্বরলোপের (syncope) নিয়মে লোপ পেয়ে এবং দন্ত্য 'স' আঞ্চলিক উচ্চারণের কারণে তালব্যীভবনের (palatalization) সূত্রে 'শ'তে পরিণত হয়ে 'মাশ্‌টর' (mashtor) শব্দে পরিণত হয়েছে। সাধারণত নোয়াখালীর আঞ্চলিক ভাষায় ঘোষীভবনের (voicing) সূত্রে 'ট' 'ড'তে পরিণত হবার একটা প্রবণতা থাকলেও 'সুটি' শব্দে 'ট' অপরিবর্তিত আছে। কেবল সকারীভবনের (assibilation) সূত্রে মূল 'ছুটি' শব্দের 'ছ' ধ্বনিটি 'স'তে পরিণত হয়েছে। 'ইস্কুলে' শব্দে কেবল আদি স্বরাগমের (prothesis) নিয়মে স্বরধ্বনি 'ই' যুক্ত হয়েছে। আবার এর উচ্চারণও মূল ইংরেজি উচ্চারণের মতো। যেমন: school/sku:l/। 'হোইট্‌টান্ ন' ও 'খাইতান্ ন' শব্দদ্বয় এসেছে যথাক্রমে 'পড়িতাম না' ও 'খাইতাম না' শব্দযুগল থেকে। 'খাইতান্ ন' শব্দটি ইতঃপূর্বে লোকজ ছড়া: ১৩ তে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। 'পড়িতাম না' এর 'প' ধ্বনিটি (sound-change) বা ব্যঞ্জন-পরিবর্তনের নিয়মে 'হ'তে

পরিণত হয়েছে। 'ড়' অন্তর্হতি বা ব্যঞ্জনলোপের সূত্রে লোপ পেলেও তার উদ্বৃত্তস্বর 'ই' অটুট রয়েছে। আর 'হ' এর 'অ' ধ্বনির পর 'ই' থাকায় উচ্চারণ-সূত্র অনুসারে তা সংবৃত উচ্চারণে 'ও' ধ্বনিতে(ে া) পরিণত হয়েছে। এরপর Cerebralization বা মূর্ধন্যীভবনের নিয়মে দন্ত্যধ্বনি 'ত' মূর্ধন্যধ্বনি 'ট'তে পরিণত হয়েছে এবং gemination বা যুগ্মীভবনের নিয়মে 'ট' দ্বিত্ব হয়েছে। নেতিবাচক অব্যয় পদ 'না' এর 'আ' ধ্বনি (া) স্বরলোপের সূত্রে লোপ পেয়েছে এবং নাসিক্য ধ্বনি 'ন' এর প্রভাবে সমীভবনের (assimilation) সূত্রে 'ম' 'ন'তে পরিণত হয়েছে। সব মিলিয়ে 'পড়িতাম না' হয়েছে 'হইট্‌টান্‌ ন'। আর 'বেতের' শব্দের 'ব' এর 'এ' ধ্বনি (ে) বিবৃত উচ্চারণে 'অ্যা' ধ্বনিতে পরিণত হওয়ায় তা হয়েছে 'ব্যাতের'।

নোয়াখালীর লোকজ ছড়ার ভাষা-বৈশিষ্ট্যের সাধারণ দিক

উপর্যুক্ত লোকজ ছড়াগুলো বিশ্লেষণে নোয়াখালীর লোকজ ছড়ার ভাষা-বৈশিষ্ট্যের কয়েকটি সাধারণ দিক সহজেই গোচরে আসে। যথা :

১। দ্বিস্বরধ্বনি (diphthong) একক স্বরধ্বনিতে পরিণত হয়েছে। যেমন: লোকজ ছড়া: ১-এর প্রথম চরণের 'আ' (a) স্বরধ্বনটি একই ছড়ার প্রমিত রূপ 'আয়' (ay) যৌগিক স্বরের পরিবর্তিত রূপ। আবার লোকজ ছড়া: ৮-এর শেষ দুই চরণের লাই' শব্দটিতে মূল 'লাগিয়া' শব্দের যৌগিক স্বর 'ইয়া' (ia) একক স্বর 'ই' (i) তে পরিণত হয়েছে। অবশ্য 'লাগিয়া' শব্দের 'গ' ধ্বনিটি অন্তর্হতি বা ব্যঞ্জনলোপের সূত্রে লোপ পাওয়ায় 'গ' এর উদ্বৃত্তস্বর 'ই' (i) 'ল' এর 'আ' (া) ধ্বনির সাথে যুক্ত হয়ে নতুন যৌগিক স্বর 'আই' (ai) সৃষ্টি করেছে।

২। নোয়াখালীর লোকজ ছড়ার শব্দে দ্বিস্বরধ্বনির একক স্বরধ্বনিতে পরিণত হবার পাশাপাশি অন্তর্হতি বা ব্যঞ্জনলোপের কারণে নতুন নতুন দ্বিস্বরধ্বনি সৃষ্টি হতে দেখা যায়। যেমন: সৈ= সখী > সই > সৈ (soi)। এখানে মূল 'সখী' শব্দে কোনো দ্বিস্বরধ্বনি না থাকলেও ব্যঞ্জনধ্বনি 'খ' লোপ পাওয়ায় সখী থেকে 'সই' এর মধ্য দিয়ে 'সৈ' শব্দের সৃষ্টি হওয়ায় এখানে দ্বিস্বরধ্বনি ওই (oi) এর সৃষ্টি হয়েছে। (লোকজ ছড়া: ১) নোয়াখালীর অন্যান্য লোকজ ছড়ায় ব্যঞ্জনলোপ, অপিনিহিতি কিংবা স্বরাগমের সূত্রে সৃষ্ট দ্বিস্বরধ্বনির অনুরূপ দৃষ্টান্ত সমূহ: কোইতর = কবুতর > কউতর > কোইতর = ওই (oi)। (লোকজ ছড়া: ৪) তুঁই = তুমি > তুঁই = উই (ui)। (লোকজ ছড়া: ৪) হোইড়বা =ওই (oi), লেইকসি = এই (ei), দিয়ালা= ইয়া (ia), আঁই = আই (ai), লাই = আই (ai)। (লোকজ ছড়া: ৮) কাইল = আই (ai)। (লোকজ ছড়া: ৯) বেইল্লা= এই (ei)। (লোকজ ছড়া: ১২) খেলাই = আই (ai)। (লোকজ ছড়া: ১৪) লাই = আই = (ai)। (লোকজ ছড়া: ৮) ব্যাইন (æi)। (লোকজ ছড়া: ১১)

৩। নোয়াখালীর লোকজ ছড়ায় দ্বিস্বরধ্বনির একক স্বরধ্বনিতে পরিণত হবার পাশাপাশি যেমন নতুন নতুন দ্বিস্বরধ্বনি গঠিত হতে দেখা যায় তেমনি কিছু

ত্রিস্বরধ্বনিরও (triphthong) পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন: আইয়েরে = আইএ (aie), বাউয়া = আউয়া (aua), সাঁইয়া= আইয়া (aia)। (যথাক্রমে লোকজ ছড়া: ১০, ১১ ও ১৩)

৪। সকারীভবনের (assibilation) নিয়মে তালব্যধ্বনির (palatal-sound) দন্ত্যধ্বনিতে (dental-sound) পরিণত হবার প্রবণতা লক্ষ করা যায়। যেমন: সখী (শোখি/sokhi) > সই > সৈ (soi) > চলতি (cholti)> সোলতি (solti) (লোকজ ছড়া: ১) > কুচালা (kuchala) > কুসালা (kusala) (লোকজ ছড়া: ২), পাঁচ ($\tilde{p}ach$) > পাঁস > হাঁস ($h\tilde{a}s$) (লোকজ ছড়া: ৩), লিখেছি (likhechi) > লেইকসি (leiksi), (লোকজ ছড়া: ৪), চাবি (chabi) > সাবি (sabi), (লোকজ ছড়া: ১২), চলেছিলাম (cholechilam) > সোইলসিলাম (soilsilam) > ছোট (choto) > সোড (sodo), (লোকজ ছড়া: ৩) চালের (chaler) > সাইলের (sailer), বসেছি (boʃechi) > বইসি (boisi), (খেয়েছি (kheyechi) > খাইছি (khaichi) (লোকজ ছড়া: ৬), চুরা (chura) > সুরা (sura), (লোকজ ছড়া: ৭) মাছের (macher) > মাসের (maser), (লোকজ ছড়া: ৮) চাঁদনি (chadni) > সান্নি (sanni) (লোকজ ছড়া: ৯)।

৫। সকারীভবনের (assibilation) নিয়মে তালব্যধ্বনির দন্ত্যধ্বনিতে পরিণত হবার পাশাপাশি কিছু দন্ত্যধ্বনিকেও তালব্যীভবনের (palatalization) নিয়মে তালব্যধ্বনিতে পরিণত হতে দেখা যায়। যেমন: মাস্টার (master) > মাশ্‌টর (maʃtor), (লোকজ ছড়া: ১৬) যাসনে > যাইচ্ছা, কিনিসনে > কিনিচ্ছা, (লোকজ ছড়া: ৯)।

৬। প্রমিত বাংলায় 'হ'কার লোপের বিষয়টি পদান্তে বেশি লক্ষ করা যায়। যেমন: আল্লাহ্ > আল্লা, বাদশাহ্ > বাদশা, শাহ্ > শা ইত্যাদি। কিন্তু নোয়াখালীর লোকজ ছড়ায় 'হ' কার লোপের বিষয়টি শব্দের আদিতে ও মাঝে বেশি লক্ষ করা যায়। যেমন: হাতি > আতি > আঁতি, কহিলে > কইলে, হাতের > আতের, হোই < হোইয়া > ওই (লোকজ ছড়া: ৩), হাঁস > আঁশ (লোকজ ছড়া: ৪)।

৭। ব্যঞ্জন-বিকৃতির (sound-change) নিয়মে কোনো কোনো ক্ষেত্রে তালব্য 'শ' ও দন্ত্য 'স' 'হ' ধ্বনিতে পরিণত হয়েছে। যেমন: সাপ > হাঁফ, শালায় > হালায় (লোকজ ছড়া: ৩), শুকনা > হুকনা > হুনা (লোকজ ছড়া: ৬), শিয়ালের > হিয়ালের (লোকজ ছড়া: ১৫)।

৮। অল্পপাণ ধ্বনি মহাপ্রাণ ধ্বনিতে এবং মহাপ্রাণ ধ্বনি অল্পপ্রাণ ধ্বনিতে পরিণত হতে দেখা যায়। এক্ষেত্রে মহাপ্রাণ ধ্বনির অল্পপ্রাণ ধ্বনিতে পরিণত হবার প্রবণতাই বেশি লক্ষ করা যায়। যেমন: দানের = ধানের > দানের, বালা = ভালো > ভালা > বালা (লোকজ ছড়া: ২), গফ = গল্প > গপ্প > গপ > গফ

(লোকজ ছড়াঃ ৩), বোন্দু = বন্ধু > বোন্দু (লোকজ ছড়াঃ ৪), রংফুরের = রংপুরের > রংফুরের (লোকজ ছড়াঃ ৫), গুম = ঘুম > গুম (লোকজ ছড়াঃ ৮), মাতা = মাথা > মাতা (লোকজ ছড়াঃ ১২)।

৯। যেকোনো ছড়ার প্রাণ হচ্ছে অনুপ্রাস। নোয়াখালীর লোকজ ছড়ায়ও অনুপ্রাসের ব্যবহার বেশ লক্ষ করা যায়। স্বাভাবিক ভাবেই প্রতিটি ছড়াতেই অন্ত্যানুপ্রাস থাকলেও মাঝে মাঝে বৃত্তানুপ্রাস ও শ্রুত্যনুপ্রাসের ব্যবহার লক্ষ করা যায়। বৃত্তানুপ্রাসের কয়েকটি দৃষ্টান্ত হলোঃ 'আ' সৈ সৈ সৈ সৈ। বিন্নি দানের খৈ।।" (লোকজ ছড়াঃ ১), "আঁশ হালি কোইতর হালি/ আরো হালি টিঁয়া।।" (লোকজ ছাড়াঃ৪), "গুম য' গুম য' লিলমনি।/নো গুম যাইলে কিল-কনি।।" (লোকজ ছড়াঃ ৮), "ব্যাইন ব্যাইন কোইতুরি।/ ব্যাইন আইসে রাইত করি।" (লোকজ ছড়াঃ ১১), অন্যদিকে শ্রুত্যনুপ্রাসের কয়েকটি দৃষ্টান্ত হলোঃ "আঁর নাম হাঁস্‌কড়ি।/কইলে কইবেন গফ করি।।" (লোকজ ছড়াঃ ৩), "বুড়িয়ার কাসে বিয়া বইসি বরাতে।/ বুড়িয়া ব্যাডার কিল খাইসি ম্যাককরে। (লোকজ ছড়াঃ ৬) "ব্যাইন ব্যাইন কোইতুরি।/বাউয়া ব্যাঙের আঁতুড়ি।।" (লোকজ ছড়াঃ ১১), "ডাক্তার খানা বৈরাগী। আঁরে এককান যিরাফি।।" (লোকজ ছড়াঃ ১৪) "শরে অ, শরে আ বগার ঠ্যাং।/মাশটর বাবু সুটি দেন।। (লোকজ ছড়াঃ ১৬)

১০। ধ্বনির অনুনাসিকতা নোয়াখালীর লোকজ ছড়ার গুরুত্বপূর্ণ ভাষা-বৈশিষ্ট্য। এক্ষেত্রে নাসিক্য ধ্বনি লোপ পাওয়ার ফলে তার পূর্ববর্তী স্বরধ্বনি অনুনাসিকতা প্রাপ্ত হয়েছে। যেমনঃ আঁর = আমার > আঁর, তুঁই = তুমি > তুঁই। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ নির্দেশিত স্বতোনাসিক্যীভবনের সূত্রে মৌখিক স্বরধ্বনি অনুনাসিক স্বরধ্বনিতে পরিণত হয়েছে। যেমনঃ গোঁড়া = ঘোড়া > গোঁড়া (লোকজ ছড়াঃ ১), আঁতি = হাতি > আঁতি, খুঁশির = খুশির > খুঁশির (লোকজ ছড়াঃ ৩), সিঁড়ি = চিঠি > সিঁড়ি (লোকজ ছড়াঃ ৪), দাঁড়ি = দাড়ি > দাঁড়ি (লোকজ ছড়াঃ ৫), হুঁনা = শুকনা > হুঁনা (লোকজ ছড়াঃ ৬), হুঁতা = সুতা = হুঁতা (লোকজ ছড়াঃ ৯), আঁড়ে = হাটে>আঁড়ে (লোকজ ছড়াঃ ৯), খ্যাঁতে = খেতে>খ্যাঁতে (লোকজ ছড়াঃ১০)।

১১। চরণান্তে অসমাপিকা ক্রিয়ার ব্যবহার বিশেষ ভাবে লক্ষণীয়। যেমনঃ লোই = লইয়া > লোই (লোকজ ছড়াঃ ১), দিয়ালা = দিয়ে ফেল > দিয়ালা (লোকজ ছড়াঃ ২), যাই' = যাইয়া > যাই' (লোকজ ছড়াঃ ৩), হালি = পালি (লালন-পালন করি) > হালি; খাইয়া, টানাইয়া (লোকজ ছড়াঃ ৪), নিতো = নিতে > নিতো (লোকজ ছড়াঃ ৫), লাই'= লাগি' / লাগিয়া > লাই ' (লোকজ ছড়াঃ ৮), করি' = করিয়া > করি (লোকজ ছড়াঃ ১১), লই' = লইয়া > লই (লোকজ ছড়াঃ ১৩), যাইতো = যাইতে > যাইতো, খাইতো = খাইতে > খাইতো (লোকজ ছড়াঃ ১৫)।

১২। ধ্বনি-পরিবর্তনের ক্ষেত্রে অপিনিহিতির ব্যবহার বেশ লক্ষণীয়। যেমন: সোইলসিলাম = চলিয়াছিলাম > সোইলসিয়াম, দেইকলাম = দেখিলাম > দেইকলাম, মাইললাম = মারিলাম > মাইললাম, বাইত = বাড়িত > বাইত (লোকজ ছড়া: ৩), লেইক্সি = লিখিয়াছি > লেইখছি > লেইক্ছি, হোইড়বা = পড়িবা > পইড়বা > হোইড়বা (লোকজ ছড়া: ৪), আইসে = আসিয়াছে > আইসে (লোকজ ছড়া: ৫), রাইনসি = রান্ধিয়াছি > রাইনসি, বইসি = বসিয়াছি > বইসি, খাইসি = খাইয়াছি > খাইসি (লোকজ ছড়া: ৬), হোইটটান ন = পড়িতাম না > হোইটটান ন (লোকজ ছড়া: ১৬)।

১৩। স্বরাগমের ক্ষেত্রে মধ্য স্বরাগমের দিকটি বেশ নজরে পড়ে। যেমন: তিরিশ = ত্রিশ > তিরিশ (লোকজ ছড়া: ৫), নাইয়ুর = নাইয়র > নাইয়ুর (লোকজ ছড়া: ১), খিলাইল = খিলাল > খিলাইল (লোকজ ছড়া: ৩), আঁতুড়ি = আঁত্ড়ি > আঁতুড়ি (লোকজ ছড়া: ১১), বাযাইতাম = বাজাতাম > বাযাইতাম (লোকজ ছড়া: ১৩), মধ্য স্বরাগমের পাশাপাশি আদি স্বরাগমের দিকটিও কম-বেশি লক্ষ করা যায়। যেমন: বারিশ = বর্ষা > বরিষা > বারিশ (লোকজ ছড়া: ১৩), মুশির = মশারি > মুশির (লোকজ ছড়া: ৪)।

উপসংহার : আলোচ্যাংশে নোয়াখালীর কয়েকটি লোকজ ছড়ার ভাষা-বৈশিষ্ট্য তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। এ রকমের অসংখ্য ছড়া ছড়িয়ে রয়েছে নোয়াখালীর লোকজীবনের পরতে পরতে, যেগুলো একাধারে এখানকার শিশুদের এবং তাদের পরিবারের বড়দের মুখে মুখে চর্চিত হয়। এসব ছড়ার সংগ্রহ ও সংরক্ষণ অত্যাবশ্যক। এর ফলে বাংলা লোকসাহিত্যের এ শাখাটি যেমন বিস্মৃতির হাত থেকে রক্ষা পাবে তেমনি বাংলা ভাষা ও সাহিত্য-ভাণ্ডার অধিকতর সমৃদ্ধ হবে।

টীকা

১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছেন :

"বুঝিতে পারিব না, কেন এত মহাকাব্য এবং খণ্ডকাব্য, এত তত্ত্বকথা এবং নীতিপ্রচার, মানবের এত প্রাণপণ প্রযত্ন, এত গলদঘর্ম ব্যায়াম প্রতিদিন ব্যর্থ এবং বিস্মৃত হইতেছে, অথচ এই সকল অসংগত অর্থহীন যদিচ্ছাকৃত শ্লোকগুলি লোকস্মৃতিতে চিরকাল প্রবাহিত হইয়া আসিতেছে।"

২. এ প্রসঙ্গে একটি ছড়ার পূর্ণরূপের এবং অপর একটি ছড়া এবং সেই ছড়া অবলম্বনে রচিত কবিতাংশের ভিন্নতার চিত্র তুলে ধরা যায়:

রবীন্দ্রনাথের 'ছেলে-ভুলানো ছড়া' প্রবন্ধে সংকলিত একটি ছড়া হচ্ছে :

আয় আয় চাঁদ মামা টী দিয়ে যা?
চাঁদের কপালে চাঁদ টী দিয়ে যা?

মাছ কুটলে মুড়ো দেব,
ধান ভানলে কুঁড়ো দেব,
কালো গোরুর দুধ দেব,
দুধ খাবার বাটি দেব,
চাঁদের কপালে চাঁদ টী দিয়ে যা ॥

একই ছড়া আবার পাঠ্য পুস্তকে স্থান পেয়েছে এভাবে :

আয় আয় চাঁদ মামা
টিপ দিয়ে যা
চাঁদের কপালে চাঁদ
টিপ দিয়ে যা ।
ধান ভানলে কুঁড়ো দেব
মাছ কাটলে মুড়ো দেব
কালো গাইয়ের দুধ দেব
দুধ খাবার বাটি দেব
চাঁদের কপালে চাঁদ
টিপ দিয়ে যা ।

আবার, 'বৃষ্টি পড়ে টাপুর টাপুর....' এ ছড়াটির আদ্য রূপ রবীন্দ্রনাথের 'ছেলে ভুলানো ছড়া' প্রবন্ধে স্থান পেয়েছে এভাবে:

বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদী এল বান??
শিবু ঠাকুরের বিয়ে হলো তিন কন্যে দান ॥
এক কন্যে রাঁধেন বাড়েন, এক কন্যে খান ।
এক কন্যে না খেয়ে বাপের বাড়ি যান ॥

একই ছড়া অবলম্বনে রচিত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'কড়ি ও কোমল' কাব্যগ্রন্থের 'বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর' কবিতার শেষ স্তবকটি তুলে ধরা যায় :

কবে বিষ্টি পড়েছিল, বান এল সে কোথা
শিব ঠাকুরের বিয়ে হল কবেকার সে কথা!
সেদিনও কি এমনিতরো মেঘের ঘটাখানা!
থেকে থেকে বাজ-বিজুলি দিচ্ছিল কি হানা!
তিন কন্যে বিয়ে করে কী হল তার শেষে!
না জানি কোন নদীর ধারে, না জানি কোন দেশে,
কোন ছেলেরে ঘুম পাড়াতে কে গাইল গান
বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর, নদেয় এল বান ॥

ছড়ার 'বৃষ্টি' কবিতায় হয়েছে 'বিষ্টি' 'শিবু ঠাকুর' হয়েছে 'শিব ঠাকুর'; আর 'নদী এল বান'-এর স্থলে হয়েছে "নদেয় এল বান ।"

৩. "যমুনাবতী সরস্বতী কাল যমুনার বিয়ে।" –এ আদ্যচরণের ছড়াটির শেষ দিকে আছে :

ওড়ফুল কুড়োতে হয়ে গেল বেলা।
তার বোনকে বিয়ে করি ঠিক দুক্ষুর বেলা ॥

এখানে 'দুপুর' শব্দটি নতুন ও অপ্রচলিত শব্দ (obsolete word) 'দুক্ষুর'-এ পরিণত হয়েছে। শিশুর পক্ষে কিংবা তার মা-খালা-দাদি-নানির শিশুকে তুষ্ট করার জন্য 'দুপুর'কে 'দুক্কুর', 'দুক্ষুর', 'দুপ্পুর' কিংবা 'দুপ্‌ফুর' উচ্চারণ করা অস্বাভাবিক কিছু নয়।

৪. এ বক্তব্যের স্বপক্ষে উদাহরণ হিসেবে একটি ছড়ার স্বরূপ তুলে ধরা যায়:

যমুনাবতী সরস্বতী কাল যমুনার বিয়ে।
যমুনা যাবেন শ্বশুর বাড়ি কাজিতলা দিয়ে ॥
কাজিফুল কুড়োতে পেয়ে গেলাম মালা।
হাত ঝুমঝুম পা ঝুমঝুম সীতারামের খেলা ॥
নাচো তো সীতারাম কাঁকাল বেঁকিয়ে।
আলোচাল দেব টপাল ভরিয়ে।।
আলোচাল খেতে খেতে গলা হল কাঠ।
হেথায় তো জল নেই ত্রিপূর্ণির ঘাট ॥
ত্রিপূর্ণির ঘাটে দুটো মাছ ভেসেছে।
একটি নিলেন গুরুঠাকুর একটি নিলেন কে।
তার বোনকে বিয়ে করি ওড়ফুল দিয়ে ॥
ওড়ফুল কুড়ুতে হয়ে গেল বেলা।
তার বোনকে বিয়ে করি ঠিক দুক্ষুর বেলা ॥

ছড়াটি আদ্যন্ত অসংগতিপূর্ণ। কারণ, যমুনাবতীর বিয়ের সাথে সীতারামের আলোচাল খেয়ে গলা কাঠ করে ফেলা, জল না থাকা সত্ত্বেও ত্রিপূর্ণির ঘাটে দুটো মাছ ভেসে ওঠা, এর একটি মাছ যে নিলেন তাঁর জাত-কুল না জেনে এবং তাঁর বোনকে না দেখে তাকে বিয়ে করার সংকল্প করা, এমনকি শুভলগ্নের কথা বিবেচনায় না এনে কেবল ওড়ফুল দিয়ে তাঁর বোনকে বিয়ে করার ভাবনা মোটেও সংগতিপূর্ণ নয়।

৫. 'আঞ্চলিক' এ অর্থে যে, অধিকাংশ মা-খালা-দাদি-নানি তাঁদের লোকজ ভাষা তথা আঞ্চলিক ভাষাতেই ছড়া কাটার চেষ্টা করেন।

'মিশ্র' এজন্য যে, অনেক স্বল্প-শিক্ষিত মা চান তাঁদের আদরের সন্তানকে আঞ্চলিক ভাষাতে নয়, মানভাষাতেই ছড়া শোনাতে। কিন্তু সেটা পুরোপুরি সম্ভব না হয়ে উঠায় ছড়ার মধ্যে আঞ্চলিক ও মানভাষার শব্দরূপের মিশ্রণ ঘটে।

আবার, 'পরিবর্তিত' এ অর্থে যে, শিশু ও তার পরিবারের লোকজন উভয় পক্ষের উচ্চারণে, বিশেষত আঞ্চলিক উচ্চারণে ছড়াগুলোর শব্দের ধ্বনিরূপের পরিবর্তন এবং তার মধ্য দিয়ে শব্দরূপের পরিবর্তন ঘটে।

৬. এভাবে স্বরধ্বনির আনুনাসিকতা প্রাপ্ত হওয়া প্রসঙ্গে মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ লিখেছেন : "কতিপয় স্থলে অকারণে স্বর অনুনাসিক হইয়াছে। ইহাকে স্বতোনাসিক্যীভবন বলা হয়।" (শহীদুল্লাহ, ২০০২ : ৮০) উদাহরণ হিসেবে তিনি দেখিয়েছেন যে, প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষার 'ছুপতি' আধুনিক বাংলায় হয়েছে 'ছোঁয়া; 'বক্র' হয়েছে 'বাঁকা'; আর 'পিপীলিকা' হয়েছে 'পিঁপড়া'।

৭. এ প্রসঙ্গে নরেন বিশ্বাস লিখেছেন, "অতিশয়োক্তি' শব্দের প্রচলিত অর্থ আতিশয্যপূর্ণ বা লোকসীমাতিরিক্ত বর্ণনা, অলৌকিক।"

৮. প্রসঙ্গ উল্লেখ্য, আধুনিক চলিত বাংলায় অনেক ক্ষেত্রে র-কার লোপ পায় এবং পরবর্তী ব্যঞ্জন দ্বিত্ব হয়।

৯. নাসিক্য ধ্বনির পরিবর্তে ধ্বনির আনুনাসিকতার ব্যবহার ভাষাবিজ্ঞানসম্মত। যেমন: অঙ্কন>আঁকা, অঞ্চল>আঁচল, কণ্টক>কাঁটা, দন্ত>দাঁত, গ্রাম>গাঁ, হংস>হাঁস ইত্যাদি।

১০. শব্দের অর্থ-পরিবর্তন প্রসঙ্গে জ্যোতিভূষণ চাকী লিখেছেন: অর্থের সম্পূর্ণ রূপান্তর ঘটতে পারে। যেমন: 'সুতরাং' মানে ছিল অত্যন্ত [সু+তরাং অভিশায়নে]। এখন অর্থ দাঁড়িয়েছে অতএব। 'এবং' মানে এইরূপে, এইভাবে। এখন তা সমুচ্চয়ী অব্যয়। সামান্য শব্দের মূল অর্থ 'সমানতা', অর্থ দাঁড়িয়েছে 'অল্প'।

১১. ইংরেজিতে অনেক ক্ষেত্রেই 'r' এর উচ্চারণ silent বা অনুক্ত থাকে। যেমন: bird (b3:d), First (f3:st), understand (Λndə́stænd) ইত্যাদি।

১২. 'রূপ' মানে বিভক্তিযুক্ত শব্দ বা ধাতু।

১৩. 'লাই' শব্দের অনুরূপ শব্দ ব্যবহারের দৃষ্টান্তস্বরূপ মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'আত্ম-বিলাপ' কবিতার অংশ বিশেষ তুলে ধরা যায় :

"আশার ছলনে ভুলি কি ফল লভিনু হায়,
তাই ভাবি মনে?
জীবন-প্রবাহ বহি কাল-সিন্ধু পানে ধায়
ফিরাব কেমনে?"

উদ্ধৃতাংশের 'ভুলি' শব্দটি এসেছে 'ভুলিয়া' থেকে। আর 'বহি' এসেছে 'বহিয়া' থেকে।

১৪. শব্দের আদিতে 'ব' ফলা অনুচ্চারিত থাকে। যেমন: ক্বাথ, জ্বলা, ত্বরা, দ্বিতীয়, শ্বাস, স্বভাব ইত্যাদি।

১৫. বৈষ্ণব কবি বিদ্যাপতি লিখেছেন:

"শীতের উড়নী পিয়া গীরিষের বা।
বরিষার ছত্র পিয়া দরিয়ার না ॥

গ্রন্থপঞ্জি

আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ (১৯৯৭)। *আধুনিক ভাষাতত্ত্ব*, দ্বিতীয় সংস্করণ, নয়া উদ্যোগ, কলিকাতা

আমার বাংলা বই, দ্বিতীয় ভাগ (সেপ্টেম্বর ২০১০)। জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা

জ্যোতিভূষণ চাকী (১৯৯৬)। *বাংলা ভাষার ব্যাকরণ*, আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড, কলিকাতা

নরেন বিশ্বাস (১৯৮৮)। *অলঙ্কার অন্বেষা*, দ্বিতীয় মুদ্রণ, কালিকলম, ঢাকা

ব্যবহারিক বাংলা অভিধান (২০১১)। চতুর্দশ পুণর্মুদ্রণ। বাংলা একাডেমি, ঢাকা

মুনীর চৌধুরী ও মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী (২০০৩)। *বাংলা ভাষার ব্যকরণ*, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা

মুহম্মদ আবদুল হাই (১৯৯৮)। *ধ্বনিবিজ্ঞান ও বাংলা ধ্বনিতত্ত্ব*, ৬ষ্ঠ মুদ্রণ, মল্লিক ব্রাদার্স, ঢাকা

মুহম্মদ আবদুল হাই ও ড. আহমদ শরীফ (২০০৫)। *মধ্যযুগের বাংলা গীতিকবিতা*, মাওলা ব্রাদার্স, নবম মুদ্রণ, ঢাকা

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ (২০০২)। *বাঙ্গালা ভাষার ইতিবৃত্ত*, তৃতীয় মুদ্রণ, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা

রফিকুল ইসলাম (১৯৯৭)। *ভাষাতত্ত্ব*, পঞ্চম সংস্করণ, বুক ভিউ, ঢাকা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (২০১০)। *সঞ্চয়িতা*, সুচয়নী পাবলিশার্স, ঢাকা

সংসদ বাঙ্গালা অভিধান (১৩৭৮) সংকলক: শৈলেন্দ্র বিশ্বাস। চতুর্থ সংস্করণ সাহিত্য সংসদ, কলিকাতা

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় (১৯৯৬)। *ভাষা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ*, রূপা সংস্করণ, কলিকাতা

স্নাতক বাংলা জাতীয় ভাষা (মে ২০০৮)। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় সাহিত্য প্রকাশনা, গাজিপুর-১৭০৪

OXFORD *Advanced Learner's DICTIONARY* 1996. Editor: Janathon Crowther, OXFORD UNIVERSITY PRESS

প্রবন্ধ-পঞ্জি

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ (১৩৩৮)। 'পল্লী সাহিত্য', *মাধ্যমিক বাংলা সংকলন গদ্য*, আগস্ট, ২০১০। জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোড, ঢাকা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৪০১)। 'ছেলে ভুলানো ছড়া'। *সংকলন*, বিশ্বভারতী, কলিকাতা

হেলাল মোশাররফ (২০১২)। 'নোয়াখালীর লোকসাহিত্যে ছড়া', *সূর্যোদয়*, স্বাধীনতা স্মারক গ্রন্থ। জেলা প্রশাসন, নোয়াখালী